গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

রচনা ও সম্পাদনা

কৃষিবিদ মোহাম্মদ সায়েদুল হক

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)

বাড়ী-১৮, রোড-০৫, ব্লক-এ মিরপুর-০২, ঢাকা-১২১৬।

ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯০০৫৪৫২,৮৮০-২-৯০১৪৯৩৩,

E-mail ঃ zalam_idf@yahoo.com

গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণের সময়সূচী

মেয়াদ ঃ

স্থান ঃ -------------------- **প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ঃ**

তারিখ ঃ -------------------- **অংশগ্রহণকারী ঃ**

অধিবেশন নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	সময়	ফ্যাসিলিটেটর
	• রেজিষ্ট্রেশন	০৯:০০-০৯:৩০	
০১	• প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী • আইডিএফ পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য • উদ্বোধন	০৯.৩০-১০.০০	
	চা বিরতি	১০:০০-১০:৩০	
০২	• দারিদ্রতা বিমোচনে গাভী পালনের গুরুত্ব • গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনেতিক উন্নয়নে গাভী পালনের ভূমিকা • জাত(পাবনা,রেড চিটাগাং,সংকর জাত) পরিচিতি • ভাল জাতের গাভীর বৈশিষ্ট্য • দেশী সংকর ও উন্নত জাতের গাভীর তুলনা	১০.৩০-১১.৩০	
০৩	• গাভীর বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা • গাভীর বাসস্থান নির্মানের বিবেচ্য বিষয় • আদর্শ ঘরের শর্তাবলী • গাভীর খাদ্য, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা • বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের কাজ ও উৎস • গাভীর আর্দশ খাদ্য তৈরীর বিবেচ্য বিষয়সমূহ	১১.৩০-১২.৩০	
০৪	• গাভীর প্রজনন • গাভী গরম এবং গর্ভাবস্থা হওয়ার লক্ষণ • কৃত্রিম প্রজনন , কৃত্রিম প্রজননেনর সুবিধা ও অসুবিধা • দেশী গাভীর জাত উন্নয়ন কৌশল	১২.৩০-১.৩০	
	নামায ও দুপুরের খাবারের বিরতি	০১.৩০-০২.৩০	
০৫	• গর্ভবতী গাভীর যত্ন • প্রসবকালীন সময়ে করণীয় বিষয়সমূহ • নবজাতক বাছুর ও গাভীর যত্ন • গাভীর দুধ দোহনের কৌশল • মান সম্মত দুধ পাওয়ার উপায় ও সংরক্ষণ	০২.৩০-০৩.৩০	
০৬	• গাভীর রোগ বালাই পরিচিতি • রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা • গাভী পালনের আয়-ব্যয় হিসাব	০৩.৩০-০৪.৩০	
	• প্রত্যাশার সমাধান • সমস্ত আলোচনার সার সংক্ষেপ • সমাপনী ও চা চক্র	০৪.৩০-০৫.০০	

সেসনঃ ১

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ঃ

এই প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- দুগ্ধবতী গাভী পালনের গুরুত্ব ও গরুর জাত সম্পর্কে জানবেন।
- গাভীর বাসস্থান ব্যবস্থাপনা ও বাছুর পালন সম্পর্কে জানবেন।
- দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানবেন।
- গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী গাভীর যত্ন, পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানবেন।
- গাভীর প্রসব পূর্ব প্রস্তুতি ও প্রসবকালীন সতর্কতা, সদ্যজাত বাছুরের পরিচর্যা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন।
- গাভী বা বকনা গরম হওয়ার লক্ষণ, কৃত্রিম প্রজনন ও গর্ভাবস্থা নির্ণয় সম্পর্কে জানবেন।
- গাভীল রোগ বালাই ও তার প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সম্পকে জানবেন।
- স্বল্প পরিসরে, বাড়ীর আশেপাশে পতিত জায়গায় ঘাস চাষ সম্পর্কে জানবেন।

প্রশিক্ষণ নিয়মাবলী ঃ

প্রশিক্ষণ ভালোভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনাদের কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। যেমন ঃ

- আলোচনা মনোযোগ সহকারে শোনা।
- কানাঘুষা না করা।
- দল বেঁধে বাইরে না যাওয়া।
- প্রশ্ন থাকলে হাত তুলে ইশারা করা।
- একজন একজন করে প্রশ্ন করা।
- প্রশিক্ষণ কক্ষে পান সুপারি না খাওয়া।
- প্রশিক্ষণ কক্ষে পানের পিক, থুথু না ফেলা।
- একে অপরের প্রতি অশোভন আচরণ না করা।
- অন্যের কথা ধৈর্য্য সহকারে শোনা।
- সবশেষে প্রশিক্ষণোপযোগী পরিবেশ তৈরীর ক্ষেত্রে প্রত্যেকের আন্তরিক থাকা।

আইডিএফ পরিচিতি ঃ

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন "আইডিএফ" গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী এন্ড ফার্মস এর সোসাইটিজ ACT XXI OF ১৮৬০ এর অধীনে রেজিষ্ট্রিকৃত এস-১৫৫১(১১১)/৯৩ একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়াও আইডিএফ বাংলাদেশ সরকারের এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো (নিবন্ধন নম্বর ঃ ৯৪১,তারিখ ২৮/০৫/১৯৯৫ইং) এবং মাইক্রো-ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (সনদ নংঃ-০১৯২০-০১৮৭২-০০২৪৯,তারিখ-১৪/০৫/২০০৮ইং) তে নিবন্ধন প্রাপ্ত। বিনা জামানতে পার্বত্য অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও সুবিধা বঞ্চিত এলাকার জনগণকে ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র থেকে মুক্ত করতেই এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু। ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে আইডিএফ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কর্মকান্ড শুরু হয় ১৯৯৩ থেকে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ছাড়াও এ সংস্থা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেনিটেশন, বিশুদ্ধ পানি, উন্নত চুলা, পশু মোটাতাজাকরণ, সৌরশক্তি, মৎস্য ও ভিক্ষুক কর্মসূচী পরিচালনা করছে।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঢাকা,রাজশাহী, নাটোর, গাজীপুরসহ মোট ১৩ টি জেলায় ৭৮ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে অত্র সংস্থা ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ছাড়াও এ সংস্থা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য,

উন্নত চুলা, পশু মোটাতাজাকরন, সৌরশক্তি, মৎস্য ও ডিগনিটি কর্মসূচী পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আওতাধীন জেলা ছাড়াও সৌরশক্তি কর্মসূচী ফেনী, নোয়াখালী, চান্দপুর, কুমিল্লা জেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে ।

আইডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব জহিরুল আলম। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা কালেই গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের উন্নয়ন কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ও জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় চাকুরী শেষে ১৯৯২ সালে দেশে ফিরে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ শুরু করেন। নোবেল বিজয়ী ড ঃ মোহাম্মদ ইউনূস, তাঁর সহকর্মী, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীগণ এ সময়ে তাঁকে এ কাজে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যোগান। ১৯৯৩ সালে গ্রামীণ ট্রাস্টের সহযোগীতায় বান্দরবান জেলার সুয়ালক মৌজায় “সুয়ালক শাখা” শাখার মাধ্যমেই এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়।

সেশনঃ ২

- দারিদ্রতা বিমোচনে গাভী পালনের গুরুত্ব
- গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনেতিক উন্নয়নে গাভী পালনের ভূমিকা
- জাত (পাবনা,রেড চিটাগাং,সংকর জাত) পরিচিতি
- ভাল জাতের গাভীর বৈশিষ্ট্য
- দেশী সংকর ও উন্নত জাতের গাভীর তুলনা

সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগন ঃ

- ❖ দারিদ্রতা বিমোচনে গাভী পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে জানবেন।
- ❖ বিভিন্ন জাতের গাভীর জাত ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবেন।
- ❖ আদর্শ দুগ্ধবতী গাভীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবেন।
- ❖ উন্নত ও দেশী জাতের গাভীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবেন।

দারিদ্রতা নিরসনে গাভী পালনের গুরুত্ব ঃ

১. আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঃ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গাভীর গুরুত্ব অপরিসীম।
২. দারিদ্রতা হ্রাস ঃ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী গাভী পালনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারে।
৩. আত্ম-কর্মসংস্থান ঃ গাভী পালন আত্ম-কর্মসংস্থানের একটি উল্লেখযোগ্য উপায়।
৪. প্রাণিজ আমিষের উৎস ঃ গবাদিপশুর মাংস ও দুধ উন্নতমানের প্রাণিজ আমিষের উৎস। গাভীর দুধ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য। সন্তানের মেধা বিকাশের জন্য দুগ্ধ প্রয়োজন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সব বয়সের সকল মানুষের জন্য দুধ একটি উপাদেয় খাদ্য।
৫. বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের উৎসঃ দুধ থেকে ঘি, মাখন, ননী, মাঠা, ঘোল, চিজ, দধি, মিষ্টি, ছানা, লাচ্ছি, বোরহানি, মন্ডা, রসমালাই, ক্ষীরসা ইত্যাদি বহুপদের লোভনীয় পুষ্টিকর সুস্বাদু খাদ্য তৈরি হয়।

দধি

লাচ্ছি

৬. আয়ের উৎস ঃ আদিকাল থেকে গ্রাম বাংলার মহিলারা বাড়তি আয়ের উৎস হিসাবে গাভী পালন করে আসছে।
৭. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ঃ চামড়া রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।
৮. অন্যান্য শিল্পের উপকরণ হিসাবে উপজাতের ব্যবহার ঃ শিং ও হাড় থেকে চিরুনি, বোতাম, ছাতা ও ছুরির বাট, প্রভৃতি তৈরি করা যায়। রক্ত থেকে হাঁস-মুরগি ও পশুর খাদ্য তৈরি করা যায়। ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে সার্জিক্যাল সুতো, টেনিস র‍্যাকেট স্ট্রিং, মিউজিক্যাল স্ট্রিং প্রভৃতি তৈরি করা যায়।
৯. জৈব সার ও জ্বালানী সাশ্রয়ে ঃ গোবর উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার। এছাড়া গোবর থেকে বায়োগ্যাস পাওয়া যায়। ঘুটে ব্যবহার করেও পারিবারিক জ্বালানী চাহিদা মেটানো যায়।

গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনেতিক উন্নয়নে গাভী পালনের ভূমিকা ঃ

দুগ্ধবতী গাভী পালন বেশ লাভ জনক আয়ের উৎস্য। গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি পরিবারে দু'একটি দুগ্ধবতী গাভী অনায়াসে লাভজনক ভাবে পালন করা যায়। ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীগণ এমনকি দারিদ্রপীড়িত মহিলাসমাজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করেই দুগ্ধবতী গাভী পালনের মাধ্যমে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ ছাড়াও সহজেই নিয়মিত বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন। গাভী পালনকে লাভজনক করার জন্য এর পালন ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্মক ধারণা থাকা আবশ্যক। ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকলে গ্রামীণ মহিলারা ভাল জাতের দুধালো গাভী পালন করে অতিরিক্ত দুধ বিক্রির মাধ্যমে নিয়মিত আয়ের বন্দোবস্ত ছাড়াও বছর বছর বাছুর বিক্রির মাধ্যমে অতিরিক্ত উপার্জন করে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

দুগ্ধবতী গাভীর বৈশিষ্ট্য ঃ

- মাথা ঃ মাথা হালকা ও ছোট আকারের, কপাল প্রশস্ত, চোখ উজ্জ্বল।
- শরীর ঃ দেহের আকার সামনের দিকে হালকা, পিছনের দিকে ভারী ও সুগঠিত, অপ্রয়োজনীয় চর্বিমুক্ত, অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুসংগঠিত।
- পাঁজর ঃ পাঁজরের হাড় সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যাবে ও গঠন হবে চ্যাপ্টা।
- চামড়া ঃ চামড়া ঢিলেঢালা, লোম মসৃণ ও চকচকে, চামড়ার নীচে চর্বি কম থাকবে।
- ওলান ঃ গাভীর দেহের আনুপাতিকে ওলান বড় দেখাবে, গঠন সুন্দর, চারটি বাট সমান দুরত্বে, সমান আকারের, পিছনের বাট দুটো তুলনামূলক একটু মোটা, পিছনের দু-পায়ের মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্ত।
- দুগ্ধ শিরা ঃ দুগ্ধ শিরা হবে মোটা ও স্পষ্ট, তলপেটে নাভীর দুপাশে আঁকাবাঁকা ভাবে বিন্যস্ত থাকবে।
- দূরে দাড়িয়ে পার্শ্বদেশ থেকে তাকালে আদর্শ দুগ্ধবতী গাভীকে অনেকটা ত্রিভূজাকৃতি লাগবে।
- শান্ত স্বভাবের এবং ধির-স্থির হবে।
- চোখ উজ্জ্বল হবে।
- পা মজবুত ও ফাঁক হয়ে ছড়িয়ে থাকবে।
- প্রতি বছর বাচ্চা দিবে।

গাভীর জাত ঃ

কোন নির্দিষ্ট এলাকার একই রকম চেহারা, আকার ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলীর অধিকারী প্রাণীসমূহকে জাত (Breed) বলে। অঞ্চলভেদে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি স্থানীয় দুগ্ধ জাতের গাভী পাওয়া যায়, যেমন- পাবনা, রেড চিটাগাং, মুন্সিগঞ্জ, ইত্যাদি। কিন্তু কালের বিবর্তনে এসব জাত আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। অধিক উৎপাদনের জন্য বিদেশ থেকে উন্নত মানের অধিক উৎপাদনশীল জাতের ষাড়ের বীজ আমদানী করে দেশে সংকর জাতের গাভী সৃষ্টি করা হয়েছে। হলস্টিন ফ্রিজিয়ান, শাহীওয়াল, সিন্ধি, জার্সী জাতের সংকর গাভী বর্তমানে দেশে পাওয়া যাচ্ছে

বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে সাধারণত দুই ধরনের গরু দেখা যায় ঃ

১) দেশী জাতের গরু- দেশী গরু আকারে ছোট, ওজনে কম কাজেই মাংস কম হয় এবং দুধ উৎপাদনও কম হয়। এ কারণে দেশী জাতের গরু পালন অলাভজনক।
২) উন্নত বা শংকর জাতের গরু- দেশী গাভীর সাথে বিদেশী/উন্নত জাতের ষাঁড় কিংবা ষাঁড়ের বীজ দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন করানোর মাধ্যমে দেশী জাতের গরুকে উন্নত বা শংকর জাতে পরিণত করা হয়। শংকর জাতের গাভী থেকে অধিক দুধ পাওয়া যায় (১০ থেকে ২০ লিটার), আকারে বড় হওয়ার কারণে অধিক মাংস পাওয়া যায় এবং এই সকল গরু পালন করা লাভজনক।

হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান ঃ

আদিবাস অস্ট্রেলিয়া। আকারে বড়, গায়ের রঙ সাদা ও কালো মিশ্রিত, কূজ অনুন্নত। গাভীর গড় ওজন ৫৫০-৬৫০ কেজি, ষাঁড়ের গড় ওজন ৮০০-৯০০ কেজি, প্রথম গর্ভধারনের বয়স ১৮-২৪ মাস, সদ্যজাত বাছুরের গড় ওজন ৩০-৩৬ কেজি, ওলান বড়, দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ৩০-৪০ লিটার।

হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান

জার্সী ঃ

আদিবাস ইংল্যান্ড। আকারে মাঝারী থেকে বড়, গায়ের রঙ ধূসর বাদামী থেকে লালচে বাদামী, কূজ অনুন্নত। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বেশ উপযোগী। গাভীর গড় ওজন ৪০০-৫০০ কেজি, ষাড়ের গড় ওজন ৬০০-৭০০ কেজি, প্রথম গর্ভধারনের বয়স ২২-২৮ মাস, সদ্যজাত বাছুরের গড় ওজন ২২-২৬ কেজি, ওলান মোটামুটি বড়, দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ৩০-৩৫ লিটার, শিং খাটো।

জার্সী

শাহীওয়াল ঃ

আদিবাস পাকিস্তান ও ভারত। আকারে মাঝারী থেকে বড়, গায়ের রঙ হালকা লাল থেকে লালচে বাদামী, কূজ সামান্য উন্নত, কপাল উঁচু, গলকম্বল খানিকটা ঝুলন্ত। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বেশ উপযোগী। গাভীর গড় ওজন ৪০০-৫০০ কেজি, ষাড়ের গড় ওজন ৬০০-৭০০ কেজি, প্রথম গর্ভধারনের বয়স ২৩-৩০ মাস, সদ্যজাত বাছুরের গড় ওজন ২০-২৫ কেজি, ওলান মোটামুটি বড়, দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ১৫-২৫ লিটার।

শাহীওয়াল

লাল সিন্ধি ঃ

উষ্ণ মন্ডলীয় ভাল দুধ অধিক উৎপাদনকারী জাত। পাকিস্তানে পাওয়া যায়। গায়ের রং লাল, কালচে হলুদ অথবা গাঢ় বাদামী হয়ে থাকে। মাঝারী আকারের সুগঠিত শরীর, খাদ্য খরচও কম। ওলান বড়। দুধ উৎপাদন ৩০০ দিনে ১৮০০ লিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক ষাড়ের ওজন ৫০০ কেজি এবং গাভী ৩৫০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

লাল সিন্ধি

রেড চিটাগাংঃ

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে পাওয়া যায়। এটিই বাংলাদেশের একমাত্র উল্লেখযোগ্য জাত। সাধারণ বৈশিষ্ট্য এরা আকারে মাঝারি, গায়ের রং হালকা লাল। শিং পাতলা ও বাঁকানো। ওলানগ্রন্থি বেশ সুঠাম কিন্তু বাট আকারে ছোট। দুধ উৎপাদন সাধারণত: এ জাতের গাভী দৈনিক ৫-৮ লিটার দুধ দেয়। গাভীর ওজন ২৫০-৩০০ কেজি এবং ষাড়ের ওজন ৩৫০-৪০০ কেজি।

রেড চিটাগাং

পাবনাঃ

পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় এই জাতের গরু পাওয়া যায়। এ জাতের গরু দেখতে সাদা ধুসর বর্নের, শিং ছোট, মাথা লম্বা, আকারে বেশ বড় হয়। গাভী সাধারনতঃ ৫-৬ লিটার দুধ দেয়।

পাবনা

দেশী ও উন্নত জাতের গাভীর তুলনাঃ

দেশী জাতের গাভী	উন্নত জাতের গাভী
আকারে ছোট	আকারে বড়
ওলার ছোট	ওলান বড়
দুগ্ধ শিরা সরু ও অস্পষ্ট	দুগ্ধ শিরা মোটা ও স্পষ্ট
১-৫ লিটার দুধ দেয়	১৫-২০ লিটারের উপর দুধ দেয়
৪-৫ মাস দুধ দেয়	প্রায় সারা বছর দুধ দেয়

সেশনঃ ৩

- গাভীর বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা
- গাভীর বাসস্থান নির্মানের বিবেচ্য বিষয়।
- আদর্শ ঘরের শর্তাবলী
- গাভীর খাদ্য, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা
- বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের কাজ ও উৎস
- গাভীর আর্দশ খাদ্য তৈরীর বিবেচ্য বিষয়সমূহ।

সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগন ঃ

- ❖ গাভীর বাসস্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে জানবেন।
- ❖ বিভিন্ন জাতের গাভীর খাদ্য ও তার কাজ সম্পর্কে জানবেন।
- ❖ গাভীর সুষম খাদ্য সম্পর্কে জানবেন।
- ❖ দানাদার খাদ্য সম্পর্কে জানবেন।
- ❖ ইউএমএস সম্পর্কে জানবেন।

বাসস্থানঃ

বাসস্থান হলো এমন একটি জায়গা যেখানে যেকোন প্রাণি (গরু, ছাগল ও ভেড়া প্রভতি) নিরাপদে আরামে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাস করতে পারে।

বাসস্থানের উদ্দেশ্যঃ

বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করা
বিভিন্ন বন্য প্রাণি এবয় চোর ও দুস্কৃতিকারীদের উপদ্রব থেকে রক্ষা করা
আরাম দায়ক পরিবেশ প্রদান করা
দৈহিক ভাবে ভাল থাকার জন্য
বিশ্রামের জন্য
রোগ প্রতিরোধের জন্য

বাসস্থানের সুবিধাঃ

- স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশের ব্যবস্থা গ্রহণ
- সহজে পরিচর্যা করার সুবিধা
- সহজে খাদ্য প্রদানের সুবিধা

প্রয়োজনীয় ঘর সমূহঃ

- গোয়াল ঘর/গরুর ঘর
- রোগাক্রান্ত পশু রাখার ঘর
- খাদ্য মজুদ ঘর

গরুর ঘরের প্রকারঃ

- উন্মুক্ত ঘর
- প্রচলিত ঘর

যেহেতু উন্মুক্ত ঘর সাধারণত বড় আকারের খামার পর্যায়ে করে থাকে। তাই এটি গ্রাম পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব।

প্রচলিত ঘরঃ

এই প্রকার ঘরে গরু বাঁধা অবস্থায় পালন করা হয়।
ঘরের মধ্যে গরু ১ বা ২ সারিতে অবস্থান করে।
প্রতিটি গরুর জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা থাকে।
সম্মুখে পিপার মধ্যে খাদ্য প্রদান করা হয়।
পিপায়/বালতিতে করে পানি প্রদানের ব্যবস্থা থাকে।
গরু প্রবেশ পথের উভয় দিকে ড্রেন থাকে।
এই ড্রেন সকাল বিকাল পরিস্কার করতে হয়।

ছোট খামারের প্রচলিত দেশী গরুর ঘর

কিভাবে ৫-১০ টি গরুর রাখার ঘর সস্তায় করা যায়ঃ

ঘরের খুঁটিঃ

- ভাল পাকা বাঁশের গোড়ায় আলকাতরা ও পলিথিন দ্বারা মুড়ে খুটি ব্যবহার করা যায়।
- ভাল শক্ত কাঠের খুঁটি ব্যবহার করা যায়

ঘরের চালঃ

- দুই পর্দা বাঁশের চাটাই/খলপা/দাড়ি এর মধ্যে পলিথিন ব্যবহার করে চালা তৈরী করা যায়
- এই চালা ১চালা/দ্বিচাল যুক্ত হতে পারে।

ঘরের মেঝেঃ

- ঘরের মেঝেতে এক/দুইস্তর ইট বিছিয়ে সোলিং করা যায়
- ইটের ফাঁকে সিমেন্ট ও বালু দিতে হবে।

এইভাবে সেমি পাকা মেঝেতে অল্প খরচে গরু পালন করা যায়

পিপা/চাড়িঃ

- সম্ভব হলে ইট সিমেন্ট দ্বারা চাড়ি (পিপা) তৈরী করা যায়।
- বাজারে মাটির তৈরী খাবার পাত্র হিসাবে চাড়ি কিনতে পাওয়া যায়
- বালতি/স্বতন্ত্র চাড়িতে পানি দেয়া যায়।

গরুর সারিঃ

- ছোট ঘরে সাধারণত ১ সারিতে গরু পালন করতে সুবিধা হয়।

ঘরের আকারঃ

- প্রতিটি গরু দাঁড়ানোর জন্য ৫ ফুট এবং শোবার জন্য ৩.৫ ফুট জায়গা লাগে
- ৫টি গরুর জন্য ঘরের মেঝের পরিমাণ হবে (৫ × ৩.৫) বর্গফুট = ১৭.৫ বর্গফুট।

গাভীর বাসস্থান নির্বাচন ঃ

- লাভজনক ডেইরী খামার স্থাপনের জন্য উপযুক্ত ও সুসংগঠিত বাসস্থানের অবস্থান হবে লোকালয় থেকে দূরে।
- বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিরাপত্তা, সুষ্ঠু পরিচর্যা, আরামপ্রদ আবাসন, ইত্যাদিও জন্য সঠিক বাসস্থান প্রয়োজন।
- খামারের ক্ষেত্রে দুগ্ধবতী গাভী, বাছুর, গর্ভবতী গাভী ইত্যাদির জন্য আলাদা শেড বা ঘর থাকলেও পারিবারিকভাবে গাভী পালনের জন্য অন্যান্য ঘর থেকে কিছুটা দূরে গোয়াল ঘর নির্মাণ করা বাঞ্চনীয়।
- ঘরের স্থান উঁচু, স্যাতস্যাতে নয়, প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশ করবে এমন স্থানে হওয়া উচিত।
- দক্ষিণ বা পূর্ব মূখী করে গোয়াল ঘর নির্মাণ করা যায় এমন জায়গা হতে হবে।
- বৃষ্টির পানি দ্রুত নেমে যাবে এবং জলাবদ্ধতা তৈরী হবে না এমন জায়গায় বাসস্থান নির্মাণ করতে হবে।

গাভীর ঘর

আদর্শ গোয়াল ঘর নির্মাণ ঃ

- গবাদিপশুর জন্য দুধরনের ঘর নির্মাণ করা যায়। যথা উন্মুক্ত ঘর/কমিউনিটি ঘর ও আবদ্ধ ঘর/প্রচলিত ঘর।
- কমিউনিটি ঘরে বেষ্টনীর ভিতরে গরু ছাড়া অবস্থায় থাকে এবং স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে পারে। কিছু জায়গায় ছাউনী থাকলেও বাকী জায়গা উন্মুক্ত থাকে। বিপরীত লিঙ্গের গরু একসঙ্গে রাখা যায় না। বেষ্টনী ঘেঁষে বাইরে খাদ্য দেয়া হয় এবং এক্ষেত্রে গাভী প্রতি গড়ে ৮০-১০০ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন পড়ে। পাবনা, সিরাজগঞ্জে বড়াল নদী তীরবর্তী এলাকায় এই পদ্ধতিতে বাথান তৈরী কওে বছরের নির্দিষ্ট ঋতুতে গাভী পালন করা হয়। গাভী বাচ্চা প্রসবের ও দোহনের জন্য পৃথক জায়গা রাখা হয়।
- আবদ্ধ ঘরে গরুকে বেঁধে রেখে লালন পালন করা হয়। ঘরে অন্তর্মূখী বা বহির্মূখী পদ্ধতিতে ২টি সারিতে অথবা এক সারিতে গরু রাখা হয় এবং খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করার জন্য গরুর সম্মুখে ফিড অ্যালী ও পানির পাত্র এবং মলমূত্র নিষ্কাশনের জন্য গরুর পিছনে সরু নালা থাকে। অল্প সংখ্যক গরুর এক সারি ঘরের জন্য ১৪-১৫ ফুট চওড়া এবং বেশী সংখ্যক গরুর ২ সারি ঘরের জন্য ২৪-২৫ ফুট চওড়া জায়গা প্রয়োজন। আকার ভেদে প্রতি গরুর জন্য গড়ে ২০-২৮ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন, ঘরের উচ্চতা ৮-১০ ফুট হতে হবে।
- দোচালা ঘরের মধ্যবর্তী উভয় চালের শীর্ষ পর্যন্ত উচ্চতা ১৪-১৫ ফুট এবং চালের ঢালু অংশের উচ্চতা হবে ৮ ফুট।
- খাদ্য সরবরাহের রাস্তা ৩-৪ ফুট, খাদ্য পাত্রের জন্য ২ ফুট, নালার জন্য ১ ফুট, গাভী দাঁড়াবার জন্য দৈর্ঘ্যে ৬-৮ ফুট ও প্রশস্তে ৪-৪.৫ ফুট জায়গা প্রয়োজন।
- বাঁশ, কাঠ, টিন, খড়, গোলপাতা, ছন বা টালি দিয়ে গোয়াল ঘর নির্মাণ করা যায়। চালে ঢেউটিন ব্যবহার করলে উহার নীচে বাঁশের তৈরী চাটাই ব্যবহার করলে তাপ নিরোধক হবে, ফলে ঘর ঠান্ডা থাকবে।
- ঘরের মেঝে কাঁচা হলে মেঝেতে বালু এবং বেলে দো-আঁশ মাটি ব্যবহার করতে হবে এবং পাকা হলে প্লাস্টার না করে ইটের হেরিং গাথুনী দিতে হয়, ফলে গরু পিছলিয়ে পড়বে না। মেঝে এমন ঢালু হবে যেন সহজেই প্রস্রাব ও পানি গড়িয়ে যেতে পারে, এতে মেঝে শুষ্ক থাকবে। ঢালু বেশী হলে গাভীর পা পিছলিয়ে ক্ষতি বা গর্ভাবস্থায় পেটের চাপ পিছনমুখী হওয়ায় প্রলাপস এর ঝুঁকি বাড়তে পারে। সম্মুখ থেকে পিছনের অংশের ঢালু সর্বোচ্চ ২.৫ ইঞ্চি হতে পারে।
- ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বাসস্থানের স্বাস্থ্য সম্মত দৈনন্দিন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা ঃ

- ঘর থেকে গাভী বা গরু বের করে নিয়ে অথবা গরু থাকা অবস্থায় দৈনিক সকাল থেকে এক বা একাধিকবার গোবর, চেনা, খাদ্যের বর্জিতাংশ পরিস্কার করে ফেলতে হবে।
- ঘরে ছাই মিশ্রিত বালু ছিটিয়ে দিতে হবে ফলে মাছির উপদ্রব কমে যাবে বা থাকবে না।
- বিশেষ করে বর্ষাকালে গোয়াল ঘরের চারিপাশে ও ম্যাঞ্জারে ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে জীবাণু মুক্ত রাখা উত্তম।
- ঘরের কোথাও যেন গর্ত বা উচু নীচু না থাকে সেদিকে নিয়মিত লক্ষ্য রাখতে হবে কেননা এতে গাভীর দাড়াতে বা বিশ্রামের জন্য শুতে কষ্ট হবে, এমনকি পা আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে।
- মশা, মাছি বা মাকড়সা যেন বাসা বাধতে না পারে এজন্য ঘরের বেড়া ও চাল প্রায়শই ঝাড়ু দিতে হবে।

গাভীর খাদ্যঃ

গবাদি পশুর বেঁচে থাকা, স্বাস্থ্য রক্ষা, উৎপাদন এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিদিন যে খাবার প্রদান করা হয় তাই হচ্ছে গবাদি পশুর খাদ্য।

গবাদি পশু বিশেষ করে গাভীর দুধ উৎপাদন ও দৈহিক বৃদ্ধির জন্য পরিমানমত সুষম খাদ্য খাওয়ানো অপরিহার্য। কোন প্রানী ছাড়া অবস্থায় থাকলে শরীরের চাহিদামতো নিজেই নিজের খাদ্য খুজে খুজে সুষম ভাবে আহার করে থাকে। যেহেতু আমরা গাভীকে বেধে পালন করি তাই খাদ্যের ৬টি উপাদান যথাঃ শর্করা, আমিষ, চর্বি, খনিজ, ভিটামিন ও পানি প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমিতভাবে সরবরাহ না করলে গাভী থেকে কখনও আশানুরুপ উৎপাদন আশা করা যায় না বরং নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গাভীর খাদ্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা ঃ

ক) আঁশ বা ছোবড়া জাতীয় খাদ্য।

খ) দানা জাতীয় খাদ্য

গ) সহযোগী অন্যান্য খাদ্য যেমন ঃ খনিজ উপাদান, ভিটামিন ইত্যাদি।

আঁশ বা ছোবড়া জাতীয় খাদ্য দু'ধরনের যথা ঃ

ক) শুস্ক খাদ্য যেমনঃ ধানের খড়, গমের খড়, খেসারী, মাসকালাই ইত্যাদির খড় বা ভূষি। শুস্ক খাদ্যে পানির পরিমাণ থাকে ১০-১৫%।

খ) রসালো খাদ্য যেমন ঃ কাঁচা ঘাস, গাছের পাতা, শাক-সবজি ইত্যাদি।

দানাদার খাদ্য সাধারণতঃ কম আঁশযুক্ত এবং শুস্ক হয়, যার মধ্যে আমিষ, শর্করা এবং চর্বি জাতীয় উপাদানগুলো বেশী থাকে। গমের ভূষি, চাউলের কুঁড়া, তিলের খৈল, খেসারী ভাংগা ইত্যাদি দানাজাতীয় খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

খাদ্যের কাজঃ

- ✓ দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- ✓ মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- ✓ দৈহিক বৃদ্ধি ঠিক রাখা।
- ✓ স্বাস্থ্য ভালো রাখা।
- ✓ রোগমুক্ত রাখা।
- ✓ খাদ্য খরচ কমানো।
- ✓ চিকিৎসা খরচ কমানো।

খাদ্য উপাদানঃ

খাদ্য উপাদান ৬ টি। আমিষ, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ লবন ও পানি।

বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের কাজ ও উৎস

১। গাভীর আমিষ খাদ্য ঃ

আমিষের কাজ ঃ

- ➢ শরীর গঠন, ক্ষয় পূরণ, বৃদ্ধি সাধন, এক কথায় শরীরে মাংসের সৃষ্টি করে।
- ➢ রক্তের উপাদান।
- ➢ বাছুর ও গর্ভবতী গাভীতে সঞ্চিত থাকে এবং প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হয়।
- ➢ দুধ উৎপাদনের ব্যবহৃত হয়।
- ➢ শক্তি পাওয়া যায়- ১ গ্রাম প্রোটিন ৪.৩ ক্যালরীর সমান।
- ➢ বিভিন্ন হরমোন ও এনজাইম তৈরীতে কাজে লাগে।
- ➢ শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকার জন্য অপরিহার্য।
- ➢ প্রজনন ও উৎপাদনের জন্য অত্যাবশ্যক।
- ➢ এন্টিবডি তৈরী বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- ➢ দুগ্ধ প্রোটিন তৈরী করে।

আমিষের অভাবে উপরোক্ত কাজসমূহ বিঘ্নিত হয়, এক কথায় পশুর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

উৎস ঃ খৈল, ডালের গুড়া বা ব্যাসন, খেসারী-মসুর-বুট-মাসকালাই, শুটকি, মাছের গুড়া, ব্লাড মিল, প্রোটিন কনসেনট্রেট, ইত্যাদি আমিষ খাদ্য হিসেবে গবাদি পশুর সুষম খাদ্য প্রস্তুতে যোগ করা হয়।

২। গাভীর শর্করা খাদ্য ঃ

শর্করার কাজ ঃ

- ➢ শরীরে শক্তি যোগায়।
- ➢ অতিরিক্ত শর্করা শরীরে চর্বি হিসেবে জমা হয়।
- ➢ চর্বি ও আমিষ শরীরের কাজে লাগতে শর্করার প্রয়োজন হয়।
- ➢ স্বাস্থ্য সুন্দর ও সতেজ রাখে।
- ➢ অনেক প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থের গাঠনিক উপাদান।

শর্করার অভাবে উপরোক্ত কার্যাবলী বিঘ্নিত হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

উৎস ঃ গম ভাঙ্গা, ভুট্টা ভাঙ্গা, চাউলের খুদ, ধানের কুড়া, গমের ভূষি, চিটা গুড়, খড়, ঘাস, লতা পাতা ইত্যাদি শর্করা খাদ্য হিসেবে গবাদি পশুর সুষম খাদ্য প্রস্তুতে যোগ করা হয়।

৩। চর্বি জাতীয় খাদ্য ঃ

শর্করার কাজ ঃ

- ➢ শরীরে শক্তি যোগায়, শর্করা অপেক্ষা ২.২৫ গুণ বেশী শক্তি পাওয়া যায়।

- শরীরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে আঘাত থেকে রক্ষা করে।
- শরীরে সঞ্চিত চর্বি অসময়ে শক্তি যোগায়।
- শরীরে তাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
- মাংসের স্বাদ বৃদ্ধি করে।
- পরিমিত চর্বি শরীর সুন্দর ও সতেজ রাখে।
- বহু জৈব পদার্থের গাঠনিক উপাদান।

চর্বির অভাবে উপরোক্ত কার্যাবলী বিঘ্নিত হয়।

উৎস ঃ খৈলে, শুটকি মাছের গুড়ায় ও ধানের কুড়াতে তেল থাকে, এছাড়া শীতের সময় গাভীকে খুব সামান্য ১% হারে সয়াবিন তেল খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যায়।

৪। খাদ্য প্রাণ বা ভিটামিন ঃ

খাদ্যপ্রাণের কাজ ঃ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যপ্রাণ পশুর শরীরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

খাদ্যপ্রাণের সাধারণ কাজসমূহ-

- শরীরের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজ সমাধা করে।
- প্রজনন কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- চোখের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখে।
- হাড় গঠনে সহায়তা করে।
- শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য।

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিনের উৎস ২টি-

১. সবুজ শাক-সবজি, লতা-পাতা, গুল্ম, ঘাস, ভূট্টাগাছ, খেসারী, বুট, মসুর কালাই গাছ, ইপিল ইপিল পাতা প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ রয়েছে এবং এগুলি ভিটামিনের প্রাকৃতিক উৎস।

২. "ফিড প্রিমিক্স" নামে ঔষধের দোকানে বিভিন্ন ভিটামিন পাওয়া যায়। প্রয়োজন হলে এই "ফিড প্রিমিক্স" নির্ধারিত মাত্রায় খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। এগুলি ভিটামিনের কৃত্রিম উৎস।

৫। খনিজ দ্রব্য ঃ

খনিজ দ্রব্যের কাজ ঃ বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য পশুর শরীরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

- শরীরের কাঠামোর আকার, শক্তি ও সামর্থ প্রদান করে।
- শরীরের গাঠনিক উপাদানের অন্যতম উপকরণ।
- শরীরের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করে।
- রক্তের অন্যতম উপাদান।
- খাদ্য হজমে এনজাইমের কাজ ত্বরান্বিত করে।
- বাচ্চা উৎপাদন ও দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য অত্যাবশ্যক।
- রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে ইত্যাদি।

খনিজ দ্রব্যের উৎস ২টি-

১. সবুজ শাক-সবজি, লতা-পাতা, গুল্ম, ঘাস, ভূট্টাগাছ, খেসারী, বুট, মসুর কালাই গাছ, ইপিল ইপিল পাতা প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে খনিজ দ্রব্য রয়েছে এবং এগুলি খনিজ দ্রব্যেরও প্রাকৃতিক উৎস।

২. "ফিড প্রিমিক্স" নামে ঔষধের দোকানে বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। প্রয়োজন হলে এই "ফিড প্রিমিক্স" নির্ধারিত মাত্রায় খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। এগুলি খনিজ দ্রব্যের কৃত্রিম উৎস।

৬। পানি ঃ

পানির অপর নাম জীবন। পশুর শরীরে শতকরা ৫৫% ভাগ পানি, বাদ বাকী অন্যান্য পদার্থ সমন্বয়ে গঠিত। দুধের শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগ পানি, কাজেই যে গাভী যত বেশী দুধ দেয় সে গাভীর জন্য তত অধিক পরিমানে পানির প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক প্রাণীরই সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য পানি অপরিহার্য।

পানির কতিপয় উল্লেখযোগ্য কাজ ঃ

- শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে পুষ্টি উপাদান পৌছে দেয়।
- শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
- শরীরের জন্য ক্ষতিকর পদার্থ নিষ্কাশন করে।
- শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়া বিক্রিয়ায় মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

- হরমোন, এনজাইম ইত্যাদি তৈরীর অন্যতম উপাদান।
- শরীরের কোষের গঠন, আকৃতি, স্থিতিস্থাপকতা ও সামর্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- লুব্রিকেন্ট হিসাবে কাজ করে।
- শরীরকে সতেজ ও সজীব রাখে

সুষম খাদ্যঃ
কোন খাদ্যে এই ৬টি উপাদান পরিমানমত থাকলে সেই খাদ্যকে সুষম খাদ্য বলে।

সুষম খাদ্যের অভাব হলেঃ
সুষম খাদ্যের অভাবে বাড়ন্ত গরু, গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী গাভী দূর্বল হয়ে পড়ে, দুধের পরিমান ও দুধের স্থায়িত্ব কমে যায়, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে ২ বছরে একবার বাচ্চা দেয় বা বন্ধ্যা হয়ে যায়।
কাঁচা ঘাসের মধ্যে জোয়ার, বাজরা, নেপিয়ার, পারা, জার্মান, জাম্বু, কাউপি, ভুট্টা, মাসকালাই, খেসারী, দূর্বা ও অন্যান্য ঘাস গাভীর অতি প্রিয় খাদ্য।

গাভীর সু-স্বাস্থ্য ও বেশি দুধ উৎপাদনের জন্য একটি গাভীকে নিম্নলিখিত তালিকা অনুসারে কাঁচা ঘাস ও দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবেঃ

১। কাঁচা ঘাসঃ

ক. দেশি জাতের গাভীঃ ৮-১০ কেজি/দিন
খ. সংকর বা বিদেশী জাতের গাভীঃ ১০-১৫ কেজি/দিন
গ. বাছুরঃ ২-৩ কেজি/দিন

২। শুকনা খড়ঃ

ক. দেশি জাতের গাভীঃ ৩-৫ কেজি/দিন
খ. সংকর বা বিদেশী জাতের গাভীঃ ৫ - ৭ কেজি/দিন
গ. বাছুরঃ ২-৩ কেজি/দিন

৩। দানাদার খাদ্যঃ

ক. দেশি জাতের গাভীঃ ২ - ৪ কেজি/দিন
খ. সংকর বা বিদেশী জাতের গাভীঃ ৩ - ৫ কেজি/দিন
গ. বাছুরঃ ১ কেজি/দিন

সুষম খাদ্যের অভাবে গাভীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ ঃ

খাদ্য উপাদান	**শতকরা পরিমাণ**
চাল ভাঙ্গা, গম ভাঙ্গা, ডাল ভাঙ্গা	২০%
চালের গুঁড়া, গমের ভূষি, ডালের ভূষি	৫০-৭৫%
তিলের খৈল, সরিষার খৈল, নারিকেলের খৈল, সয়াবিনের খৈল ফিস মিল, মিট	২০-২৫%
লবণ, ঝিনুকের গুঁড়া, বোন মিল, ডিমের খোসার গুঁড়া, ডাই কেলসিয়াম ফসফেট	১-২%

সুষম দানাদার খাদ্যের মিশ্রণঃ

ক্রঃ নং	**উপকরণের নাম**	**১০০ কেজির জন্য**	**১০ কেজির জন্য**
১	গমের ভুষি	৩০ কেজি	৩ কেজি
২	চাউলের কুড়া	২৫ কেজি	২.৫ কেজি
৩	খেসারী কালাই চূর্ণ	১২ কেজি	১.২ কেজি
৪	মাস কালাই চূর্ণ	১২ কেজি	১.২ কেজি
৫	তিলের খৈল	২০ কেজি	২ কেজি
৬	লবণ	১ কজি	১০০ গ্রাম
	মোট	**১০০ কেজি**	**১০ কেজি**

সাধারন দানাদার খাদ্যঃ

ক্রঃ নং	উপকরণের নাম	১০০ কেজির জন্য	১০ কেজির জন্য
১	গমের ভুষি	৪০ কেজি	৪ কেজি
২	চাউলের কুড়া	২৪ কেজি	২.৪ কেজি
৩	খেসারী কালাই চূর্ণ, মাস কালাই চূর্ণ, মশুর ভুষি	১৫ কেজি	১.৫ কেজি
৪	তিলের খৈল	২০ কেজি	২ কেজি
৫	লবণ	১ কজি	১০০ গ্রাম
	মোট	**১০০ কেজি**	**১০ কেজি**

বাছুরের দানাদার খাদ্য মিশ্রণঃ

উপকরণ	**পরিমাণ (কেজি)**
গমের ভূষি	৩.০০
চালের কুড়া	২.০০
খেসারী/মাটি কলাই	২.০০
তিলের খৈল	১.০০
ছোলা	০.৫০
সয়াবিন খৈল	১.০০
চিটাগুড়	০.৩৭৫
ঔবন	০.১০০
ভিটামিন	০.০২৫
মোট	**১০.০**

- ✓ উপরোক্ত খাদ্য কনা অবশ্যই সতেজ হতে হবে
- ✓ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও ধুলিকনা মুক্ত থাকতে হবে
- ✓ খাদ্য কনা ভালোভাবে মিশিয়ে বস্তাাবন্দী করে রাখতে হবে
- ✓ দৈনিক দুইবার দানাদার খাবার সরবরাহ করতে হবে
- ✓ দুধের গাভীকে দুধ উৎপাদনের উপর হিসাব করে দানাদার ও অন্যান্য খাদ্য প্রদান করতে হবে। প্রথম ৩ লিটার দুধের ৩ কেজি খাদ্য এবং পরবর্তী ২.৫ লিটার দুধের জন্য ১ কেজি করে সর্বাদিক ৮ কেজি পর্যন্ত দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে
- ✓ প্রতি গাভীকে প্রতিদিন ১৫০-২৫০ গ্রাম করে নালীগুড় খাওয়াতে হবে।
- ✓ জীবানুমুক্ত সচ্ছ ঠান্ডা পানি সরবরাহ করতে হবে। শীতকালে কুসুম গরম পানি খাওয়াতে হবে।

গর্ভবতী অবস্থায়ঃ

গর্ভকালীন ৫ মাস থেকে বাচ্চা দেয়ার আগ পর্যন্ত গাভীকে প্রতিদিন খাবারের পরিমান বাড়িয়ে দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে প্রায় দ্বিগুন পরিমান দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে। এত গাভীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে সুস্থ্য সবল বাছুর পাওয়া যাবে এবং বাচ্চা প্রসবের পর দুধ উৎপাদন আশানুরপ বৃদ্ধি পাবে।

- ✓ একটি দুগ্ধবতী/গর্ভবতী গাভীর দৈনিক ৪০-১০০ লিটার পর্যন্ত পানির প্রয়োজন। গরমকালে নিদিষ্ট পরিমান পানির সাথে দানাদার খাদ্য মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
- ✓ দৈনিক দুইবার সকাল ১০ ঘটিকায় এবং বিকাল ৫ ঘটিকারয় সমান ভাগ করে দানাদার খাদ্য ও পানি খাওয়ালে গাভীর দুধ উৎপাদন ও শরীরের বৃদ্ধি ভালো হয়।

সহায়ক অংশগ্রহনকারীদের বলবেন যে, শুকনো খড় খাওয়ালে গাভীর ওজন কমে যেতে পারে। অথচ আমাদের হাতের কাছেই আমিষের উৎস হিসেবে ইউরিয়া ও চিটাগুড় আছে। এই ইউরিয়া ও চিটাগুড় এবং খড় এর মিশ্রিত খাবার যা গাভীকে প্রতিদিন শুকনো খাবারের পরিবর্তে চাহিদামত খাওয়ানো যায়।

গো- খাদ্য হিসেবে ইউরিয়া মোলাসেস ও স্ট্র এর ব্যবহারঃ

ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র বা ইউ এম এসঃ

ইউরিয়া, মোলাসেস (চিটা গুড়) এবং স্ট্র (খড়) এর একটি মিশ্রিত খাবার যা প্রতিদিন শুকনো খড়ের পরিবর্তে চাহিদা মত গরুকে খঅওয়ানো যায়।

শুকনো খড়ের সাথে ইউরিয়া খাওয়ানোর কৌশল ঃ

শুকনো খড়ের সাথে ইউরিয়া খাওয়ানো যায়। ইউরিয়ার সাথে মোলাসেস মিশিয়ে উহা শুকনো খড়ের উপর স্প্রে করে অতঃপর নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী গরুকে খাওয়াতে হয়। এজন্য ৮২ ভাগ খড় ১৫ ভাগ মোলাসেস ও ৩ ভাগ ইউরিয়া সার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নিম্নে বর্ণিত উপায়ে খড় প্রক্রিয়াজাত করা যায়।

- প্রথমে প্রয়োজনী সব উপাদান যেমন শুকনো খড়, মোলাসেস, ইউরিয়া ও পানি সঠিকভাবে মেপে নিতে হবে।
- অতঃপর পানিতে ইউরিয়া সার মিশিয়ে হালকা নাড়িয়ে গুলিয়ে নিয়ে এবং উহাতে মোলাসেস ঢেলে খুব ভাল ভাবে মিশ্রণ তৈরী করে নিতে হবে।
- খড় ৩-৪ ইঞ্চি টুকরো টুকরো করে কেটে নিতে হবে।
- পরিস্কার পাকা জায়গায় বা মাটির উপর পলিথিন বিছিয়ে উহার উপর সমানভাবে খড় বিছিয়ে তার উপর ইউরিয়া মোলাসেস মিশ্রিত দ্রবণ স্প্রের ন্যায় ছিটিয়ে দিতে হবে। খড়ের পরিমাণ বেশী হলে স্তরে স্তরে বিছানো ও স্তরে স্তরে এই দ্রবণ ছিটিয়ে দিয়ে ভালভাবে খড়ের সাথে দ্রবণ এমনভাবে মেশাতে হবে যেন খড় সমস্ত দ্রবণ শুষে নেয়।
- বাঁশের ডোলে বা মাটির চাড়িতে বা মাটির গর্তে পলিথিন বিছিয়ে তার মাঝে খড় চুবিয়ে সমান ভাবে ভিজিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র বা ইউএমএস তৈরী করে তাৎক্ষণিক সময় থেকে পরবর্তী ৭২ ঘন্টা বা তিন দিন পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াজাত খড় আস্তে আস্তে গরুকে খাওয়ানো যায়।
- তৃতীয় দিনের পর থেকে আর সংরক্ষিত প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো উচিত নয়, কেননা, এ সময় খড়ে জলীয় অংশ ও মোলাসেসের পরিমাণ কমতে থাকে।
- এভাবে প্রক্রিয়াজাত খড় নিয়মিত খাওয়ালে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কারন উক্ত খাদ্য প্রনালী গরুর রুমেনের পরিবেশ ঠিক রাখতে সহায়তা করে।

বিভিন্ন পরিমাপের ইউএসএস তৈরী পদ্ধতিঃ

✓ খড় ১ কেজি, পানি ৫০০ গ্রাম, চিটাগুড় ২৫০ গ্রাম, ইউরিয়া ৩০ গ্রাম

খড় ১ কেজি	পানি ৫০০ গ্রাম	চিটাগুড় ২৫০ গ্রাম	ইউরিয়া ৩০ গ্রাম
খড় ২ কেজি	পানি ১ লিটার	চিটাগুড় ৫০০ গ্রাম	ইউরিয়া ৬০ গ্রাম
খড় ৫ কেজি	পানি ২.৫ লিটার	চিটাগুড় ১.২৫ কেজি	ইউরিয়া ১৫০ গ্রাম
খড় ১০ কেজি	পানি ৫ লিটার	চিটাগুড় ২.৫ কেজি	ইউরিয়া ৩০০ গ্রাম

ইউ এম এস খাওয়ানোর নিয়মঃ

ক. ইউ এম এস বাছুর, বাড়ন্ত, দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী গাভী অথবা মহিষকে তাদের চাহিদা মত খাওয়ানো যায়

খ. শুধু ইউ এম এস খাওয়ালেও গরুর ওজন বৃদ্ধি পায়

গ. বাড়ন্ড় ষাঁড় বাচুরকে দৈনিক ১৪০০ গ্রাম গমের ভুঁষি ও ১০০ গ্রাম মাচের গুড়ো দিয়ে শুকনো খড়ের পরিবর্তে ইউ এম এস খাওয়ানো হলে দৈহিক ওজন বৃদ্ধি ৫০০ গ্রাম থেকে বেড়ে ৭০০ গ্রাম হয়

ঘ. গাভীকে শুকনো খড়ের পরিবর্তে ইউএমএস খাওয়ালে গাভী প্রতি দৈহিক দানাদার খাদ্যের পরিমান ১ কেজি কম দিয়েও দুদের উৎপাদন প্রায় ১.০ লিটার বেড়ে যায়।

কেন ইউ এম এস খাওয়ালে গরুর দুধ বা ওজন বৃদ্ধি পায়?

ক) গরুর রুমেনের (পাকস্থলী) প্রয়োজন মোতাবেক আস্তে আস্তে খড়ের সহিত ইউরিয়া হহে নাইট্রোজেন এবং মোলাসেস হতে শর্করার সরবরাহ পেয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, মোলাসেস একইভাবে খনিজ পদার্থও পশুকে সরবরাহ করে

ইউএমএস ব্যবহারের সুবিধাঃ

ক) ইউএমএস তৈরী পদ্ধতি সহজ। একজন অনায়াসে দৈনিক ৫০০-৬০০ কেজি খড় এভাবে তৈরী করতে পারেন। খড়ের দাম বাদ দিলে ইউরিয়া, মোলাসেস ও শ্রমিক খরচ বাবদ কেজি প্রতি ইউ এম এস এর খরচ পড়ে ০.৬৫ হতে ০.৭৫ টাকা। মোলাসেস ও শ্রমিকের মূল্যের উপর এ খরচ নির্ভর করে।

খ) গবেষণা থেকে দেখা যেছে এ পদ্ধতিতে খড়ের সংগে ১.০০ টাকার মোলাসেস খায়ে ৫.০০ থেকে ৭.০০ টাকা মুল্যের গরুর মাংস উৎপাদন সম্ভব।

গ) ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক চেটে খাওয়ালে প্রানির যে উপকার হয় তা ইউএম এস দ্বারাই সম্ভব। উপরোক্ত কৃষক কম মূল্যে নিজের বাড়ীতেই ইউএমএস তৈরী করতে পারেন। ব্লক চেটে খাওয়ানোর মত কোন ঝামেলা এ পদ্ধতিতে নেই।

ঘ) যেহেতু ইউরিয়া মোলাসেস খড়ের সাথে ধীরে ধীরে খাচ্ছে অতএব বিষক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

ঙ) সকল বয়সের গরু ও মহিষ যথেষ্ট পরিমান এ খাদ্য গ্রহন করতে পারে।

চ) গর্ভবতী প্রানিও এ খাদ্য খেতে পারে।

ছ) গরু মোটাতাজকরনেও এ খাদ্য সাফল্যজনকভাবে ব্যবহার করা যায়
জ) কৃষক তার দৈনিক চাহিদানুযায়ী খড় প্রস্তুত করে প্রতিদিন খাওয়াতে পারে।

ইউএমএস প্রস্তুত প্রণালী

ইউএমএস ব্যবহারের অসুবিধাঃ
ইউ এম এস পদ্ধতিতে ইউরিয়া মোলাসেস খাওয়ানোর তেমন কোন অসুবিধা নেই। শুধু মাত্র ইহা তৈরী করে তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করে রাখা যায় না। তবে এর সংরক্ষন সময় বাড়ানোর জন্য আরও গবেষনা হচ্ছে।

সাবধানতাঃ
- ✓ অবশ্যই ইউ এম এস তৈরী করার সময় ইউরিয়া, মোলাসেস, খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে। ইউরিয়ার মাত্রা কোন অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না। ইউ এম এস এর গঠন পরিবর্তন করলে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাবে না।
- ✓ ইউরিয়া মোলাসেস ষ্ট্র সংক্ষেপে ইউ এম এস গরুর জন্য একটি উপাদেয় এবং উপকারী খাদ্য যা কম মূল্যে কৃষকের বাড়ীতেই সহজে প্রস্তুত করা যায়। ইহা গবাদি পশুকে খাওয়ালে দৈহিক ওজন দুধ উৎপাদন লাভজনকভাবে বৃদ্ধি পায়।
- ✓ অন্যভাবেও ইউএমএস তৈরী করা যায়, এ পদ্ধতিতে মাটির চাড়িতে ওজন করা মোলাসেস ও ইউরিয়া পরিমান মত পানি দিয়ে দ্রবণ তৈরী করতে হবে। এখন সারণীতে উল্লেখিত হিসাবে মোতাবেক ওজন করা খড় এমনভাবে ভিজাতে হবে যাতে পুরো দ্রবণটি চুষে নেয়। উক্ত যে কোন উপায়ে ইউরিয়া মোলাসেস খড় গরুকে খাওয়ানো যায় অথবা ২/৩ দিনের তৈরী খড় সংরক্ষণ করে আস্তে আস্তে খাওয়ানো যায়। তবে কোন পদ্ধতিতেই খড় বানিয়ে নিত্য দিনের বেশী রাখা উচিত নয়। কারণ তাতে খড়ে ইউরিয়া এবং মোলাসেস এর পরিমান থাকবে না।

গবাদিপশুতে ইউরিয়া বিষক্রিয়ার লক্ষণ ঃ
- ➢ নিয়মানুযায়ী প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পরিমাণমত খাওয়ালে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে এর ব্যতিক্রম ঘটলে বিষক্রিয়া হতে পারে।
- ➢ খাওয়ার পর অস্বাভাবিক লালা ঝরা ও পেট ফুলে যাওয়া।
- ➢ ঘন ঘন প্রস্রাব পায়খানা হওয়া।
- ➢ শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়া।
- ➢ শরীরের বিভিন্ন অংশের মাংস কাঁপতে থাকা।

গবাদিপশুতে ইউরিয়া বিষক্রিয়ায় করণীয় ঃ

- অতি দ্রুত ভেটেরিনারী চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- সকল প্রকার ভারী খাদ্য খাওয়ানো বন্ধ রাখতে হবে।
- পশু যেন শুয়ে পড়তে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- পেটে অতিরিক্ত গ্যাস হয়েছে প্রতিভাত হলে ট্রকার-ক্যানুলা ব্যবহার করে গ্যাস বের করে দিতে হবে।
- ভিনেগার বা সিরকা সমপরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

দানাদার খাদ্যের সাথে ইউরিয়া খাওয়ানোর কৌশল ঃ(ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক)

দানাদার খাদ্যের সাথেও ইউরিয়া মোলাসেস খাওয়ানো যায়। এক্ষেত্রে ইউরিয়া ও মোলাসেস দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে ব্লক তৈরী করে অতঃপর খাওয়ানো হয়। নিম্নে বর্ণিত উপায়ে ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক বা ইউএমবি তৈরী করা যায়।

- ইউএমবি তৈরীতে ৫০-৬০ ভাগ মোলাসেস, ২৫-২৬ ভাগ গমের ভূষি, ৮-৯ ভাগ ইউরিয়া ও ৫-৬ ভাগ পাথরে চুন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
- ১০ কেজি ইউএমবি তৈরীর জন্য ৫ কেজি মোলাসেস, ২.৫-৩.০ কেজি গমের ভূষি, ৭০০-৮০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০-৬০০ গ্রাম চুন, ৩০-৫০ গ্রাম লবণ, বড় কড়াই, নাড়ানী কাঠি ইত্যাদি প্রয়োজন হবে।
- পাথুরে চুন ভেঙ্গে গুড়ো করে নিতে হবে; লবণ, ইউরিয়া, চুন একত্রে মিশিয়ে প্রস্তুত রাখতে হবে।
- কড়াইতে প্রয়োজনীয় মোলাসেস ঢেলে চুলোয় উত্তপ্ত করে নিতে হবে এবং উহাতে লবণ, ইউরিয়া ও চুনের মিশ্রণ ঢেলে নাড়ানী দিয়ে নেড়ে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।
- অতঃপর উহাতে গমের ভূষি অল্প অল্প করে মিশিয়ে নাড়াতে হবে। এভাবে সবটুকু ভূষি সমানভাবে মেশানো হলে সেমি সলিড আঠালো জমাট মিশ্রণ তৈরী হবে।
- এমতাবস্থায় উহা কড়াই থেকে নামিয়ে নির্দিষ্ট আকৃতির ছোট বাক্সে বা ছাঁচে ঢেলে কিছুক্ষণ রেখে ঠান্ডা করে অতঃপর সাবধানে বাক্স বা ছাঁচ তুলে নিয়ে ইটের ন্যায় ব্লক তৈরী করা যেতে পারে।
- এভাবে প্রস্তুতকৃত ইউএমবি শুষ্ক অবস্থায় প্রতিটি গরুকে অন্যান্য স্বাভাবিক খাদ্যের পাশাপাশি দৈনিক ২৫০-৩০০ গ্রাম হিসেবে খাওয়ানো যেতে পারে।

চিত্র ঃ ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক তৈরীর উপকরণ ও ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক প্রস্তুত করণ

গো-খাদ্য হিসাবে সবুজ ঘাস, দানাদার খাদ্য ও শুকনো খড়ের পাচ্যতা ঃ

- গো-খাদ্য হিসাবে সবুজ কাচা ঘাস খুবই উপাদেয় ও প্রয়োজনীয়। কথায় বলে গরু ঘাস খায়। গাভীর মুখে দিলে ঘাস, দুধ পাবেন বার মাস। অর্থ্যাৎ গরু শুধু ঘাস খেয়েই বাঁচতে পারে এবং সবুজ ঘাসের নিয়মিত প্রাপ্তিতে দুধের উৎপাদন বাড়ে ও উৎপাদন কাল দীর্ঘায়িত হয়। সবুজ ঘাসে যথেষ্ট পরিমাণে জলীয়বাষ্প থাকে, চিবানো ও গলাদকরণ সহজ, প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-মিনারেল থাকে। সবুজ ঘাসের পরিপাচ্যতা বেশী।

কাচা ঘাস কেটে খাওয়ানো

খড় ও কাচা ঘাসের মিশ্রন

- দানাদার গো-খাদ্যে শর্করা, আমিষ, চর্বি ইত্যাদি পুষ্টি উপাদান অধিক হারে থাকে বিধায় পরিপাকের ফলে বেশী পরিমানে বিপাকীয় শক্তি উৎপন্ন হয়। এছাড়া দানাদার খাদ্যের প্রাপ্তিতে উৎপাদিত দুধে ফ্যাট বা ননীর শতকরা উপস্থিতি বেশী হয়। দানাদার খাদ্যের পরিপাচ্যতা বেশী।
- গো-খাদ্য হিসেবে বছরব্যাপী সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় শুকনো খড়। দেশে যে বিপুল পরিমাণ ধান চাষ হয়, তার খড়ের ব্যবহারের উত্তম পন্থা হলো গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার। সবুজ ঘাস সংরক্ষণের চেয়ে শুকনো খড় সংরক্ষণ সহজ বিধায় ইহা বছরব্যাপী ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শুকনো খড়ের পুষ্টিমাণ ও পরিপাচ্যতা উভয়ই সবুজ ঘাস বা দানাদার খাদ্যের চেয়ে অনেক কম। খড়ের পরিপাচ্যতা মাত্র ৪০-৪৫%। অর্থ্যাৎ ১০০ কেজি খড় খেলে তার মাত্র ৪০-৪৫ কেজি হজম হয় এবং বাকী ৫৫-৬০ ভাগ গোবর হিসেবে বেরিয়ে যায়। যেহেতু বছরব্যাপী শুকনো খড়ের প্রাপ্যতা তুলনামূলক বেশী এবং বহুল ব্যবহৃত, তাই আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে এই খড় প্রক্রিয়াজাত করে এর পরিপাচ্যতা বাড়ানো হয়ে থাকে।

গাভীর খাদ্য তৈরীর বিবেচ্য বিষয়সমুহঃ

- ✓ যে সকল খাদ্য সহজে ও সস্তায় পাওয়া যায় সে সব খাদ্য প্রস্তুত করা উচিত
- ✓ খাদ্য অবশ্যই সুস্বাদু হবে।
- ✓ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী দিয়ে গাভীর খাদ্য প্রস্তুত করা উচিত
- ✓ খাদ্য অবশ্যই সুস্বাদু হবে
- ✓ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী দিয়ে গাভীর খাদ্য প্রস্তুত করা উচিত
- ✓ খাদ্য টাটকা হতে হবে
- ✓ ময়লা, কাঁকর, পাথর, মাটি দুর্গন্ধমুক্ত হতে হবে।
- ✓ খেয়াল রাখতে হবে, খাদ্য খেলে যেন পশুর পেট ভরে এবং পুষ্টির অভাব দুর হয়
- ✓ গবাদী পশুর জন্য ঘাস আবশ্যক
- ✓ খাদ্য উপাদান সহজে পরিবর্তন করা উচিত নয়, নিতান্তই পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে ধীরে ধীরে দিনে দিনে পরিবর্তন করতে হবে।
- ✓ খাদ্য অবশ্যই সঠিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করতে হবে।

এবার ২০০ কেজি ওজনের গাভী দৈনিক ৪ কেজি দুধ দেয়, তার জন্য রসদ ঃ

আঁশ জাতীয় খাদ্য

- ✓ গাভীর জন্য 'হে' প্রয়োজন = ২ x ৩ = ৬ কেজি
- ✓ কাঁচা ঘাসের পরিমাণ = ৬ x ২ = ১২ কেজি
- ✓ সুতরাং ৩ কেজি 'হে' = ৩ x ৩.৫ = ১০.৫ কেজি কাঁচা ঘাস দিতে হবে।
- ✓ এবং বাকী ৩ কেজি 'হে' = ৩ কেজি খড় দিতে হবে।
- ✓ তাহলে মোট আঁশ জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ = ৩ কেজি খড় এবং ১০.৫ কেজি কাঁচা ঘাস।

দানাদার খাদ্য

- ✓ প্রথম ৩ কেজি দুধের জন্য ১.৫ কেজি দানাদার মিশ্রণ
- ✓ পরবর্তী ১ কেজি দুধের জন্য ০.৫ কেজি দানাদার মিশ্রণ
- ✓ সুতরাং ১.৫ + ০.৫ = ২.০ কেজি দানাদার মিশ্রণ

তাহলে মোট রসদ দাঁড়ালো ঃ

- ✓ খড় = ৩ কেজি; কাঁচা ঘাস = ১০.৫ কেজি; দানাদার মিশ্রণ = ২.০ কেজি; লবণ = ৬০ গ্রাম

একটি মাঝারী আকারের (৩০০ কেজি) দুগ্ধবতী (দুধ উৎপাদন ১৫ লি./দৈনিক) গাভীর জন্য সুষম খাদ্য তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১. কাঁচা সবুজ ঘাস	৯ থেকে ১২ কেজি
২. শুকনা খড়	৩ থেকে ৪ কেজি
৩. দানাদার কাদ্য মিশ্রণ	৭ কেজি
ক) ধানের কুড়া	১.৪ কেজি
খ) গমের ভূষি	৩.৫ কেজি
গ) খেসারী বা অন্য ডাল ভাঙ্গা	১.২৬ কেজি
ঘ) তিল/বাদাম/সরিষা খৈল	০.৭ কেজি
ঙ) লবণ	৭০ গ্রাম
চ) প্রিমিক্স	৭০ গ্রাম
মোট	৭ কেজি

বাছুরের খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা ঃ

- জন্মের পর থেকে ৩ মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরকে নিয়মিত অন্ততঃ দুবেলা মায়ের দুধ খেতে দিতে হবে।
- বাছুরের ওজনের ন্যূনতম ১০ ভাগের এক ভাগ অর্থ্যাৎ ২০ কেজি ওজনের বাছুরের জন্য দৈনিক অন্ততঃ ২ লিটার দুধের প্রয়োজন। অন্যথায় বাছুরের স্বাস্থ্য খারাপ হবে এবং কৃমির আক্রমণ হতে পারে।
- দু সপ্তাহ পর থেকে বাছুরকে নরম সবুজ কাচা ঘাস ও দানাদার খাদ্য দিতে হবে, এতে পাকস্থলীর বৃদ্ধি আসবে এবং হজম শক্তি বাড়বে।
- প্রথম সপ্তাহে ২ লিটার, ২য় সপ্তাহে ৩ লিটার, ৩য় সপ্তাহে ৩ মাস বয়স পর্যন্ত দৈনিক ৪ লিটার, ৪র্থ মাসে ৩ লিটার দুধ এবং একই সময়ে ২য় সপ্তাহ থেকে যথাক্রমে ২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম ও ৭০০ গ্রাম কাফ স্টার্টার (দানাদার খাদ্য মিশ্রণ) ও পাশাপাশি পরিমাণ মহ সবুজ ঘাস খেতে দিতে হবে।
- কাফ স্টার্টার শতকরা ৫০ ভাগ গমের ভূষি বা ভুট্টা ভাঙ্গা, ২৪ ভাগ ডালের ভূষি ও ছোলা ভাঙ্গা মিশ্রণ, ২৫ ভাগ খৈল ও ১ ভাগ খনিজ লবণ থাকতে হবে।

সেশনঃ ৪

- দেশী গাভীর জাত উন্নয়ন কৌশল
- গাভী গরম হওয়ার লক্ষণ
- গাভীর প্রজনন
- কৃত্রিম প্রজনন, কৃত্রিম প্রজননেনর সুবিধা ও অসুবিধা
- গাভী গর্ভাবস্থা হওয়ার লক্ষণ

দেশী গাভীর জাত উন্নয়ন কৌশলঃ

আমাদের দেশী গাভী গড়ে মাত্র ১-১.৫ লিটার দুধ দিয়ে থাকে। সেখানে উন্নত জাতের গরু ২০-৪০ লিটার পর্যন্ত দুধ দেয়। খামারের জন্য দরকার উন্নত জাতের গরু যারা বেশি দুধ বা মাংস দিবে ও বেশি মুনাফা অর্জন করা যাবে।

দুগ্ধবতী গাভী/মহিষ পালনের প্রথম শর্ত হল অধিক উৎপাদনশীল জাতের গাভী/মহিষ। যেহেতু আমাদের দেশে অধিক উৎপাদনশীল জাত নাই তাই এ অধিক উৎপাদনশীল জাতের পশুর প্রাপ্যতা নির্ভর করে নির্বাচিত প্রজনন ব্যবস্থাপনার উপর। যেখান থেকে দুগ্ধবতী জাতের গাভী উৎপাদন হতে পারে। অধিক উৎপাদনশীল জাতের ষাঁড়ের অপর্যাপ্ততার কারণে বিদেশী জাতের ষাড়ের বীজ দিয়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে নিজেদের বাড়ীতে জাত তৈরী করে নিতে হবে। কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রে সঠিক রেকর্ড না থাকার কারণে আন্তঃপ্রজনন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

গবাদিপশু থেকে কাংখিত উৎপাদন পাওয়ার জন্য জাত নির্বাচন অতীব জরুরী। বংশগত বৈশিষ্ট্য ভাল না হলে শুধুমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে সম্ভব নয়। অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য অধিক উৎপাদনশীল জাতের বংশ বাছাই করণের প্রয়োজন। আমাদের দেশে স্থানীয় জাতের মধ্যে বিভিন্ন দুগ্ধ পকেট এলাকা যেমন পাবনা, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ছাড়াও অন্যান্য এলাকাতেও কিছু কিছু গাভী পাওয়া যায় যারা প্রচুর দুধ ও বছর বছর বাচ্চা দেয়। সে সমস্ত গাভীর বাচ্চা সংরক্ষণ করা গেলে আস্তে আস্তে উন্নত জাত তৈরী করা যাবে। এদের ষাড় বাচ্চা সংরক্ষণ করে প্রজননের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদন বৈশিষ্টসমূহ দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া যাবে। প্রজননকারী ষাড়ের সাথে নিকট আত্মীয় কোন বকনা বা গাভীর সাথে প্রজনন করা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আন্তঃপ্রজনন বা ইনব্রিডিং এড়িয়ে চললে অধিক দুধ উৎপাদন বৈশিষ্ট সম্পন্ন জাত নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

বর্তমানে যে সমস্ত গাভী এক-দেড় লিটার দুধ দেয় সে সমস্ত গাভী পালন করা কখনও লাভজনক হবেনা। এদেরকে কৃত্রিম প্রজনন করালে উৎপাদিত বাছুর পর্যাপ্ত দুধও পাবেনা ফলে বাছুরটি অপুষ্টিজনিত কারনে মারা যাবে বা অসুস্থ থাকবে। সুতরাং এদেরকে পাল থেকে ছাটাই/বাতিল করে তার স্থলে বেশী উৎপাদনের গাভী সংগ্রহ পূর্বক পালন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কম উৎপাদনশীল গাভী পালনে যে শ্রম দেয়া হয় ঐ একই পরমান শ্রম ব্যয় করে বেশী উৎপাদনের গাভী পালন করলে খাদ্য খরচের পরও প্রচুর লাভ থাকবে।

বিদেশী জাতের গাভী পালন ও প্রজননকালে আমাদের দেশের আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা আবশ্যক। কৃত্রিম প্রজনন কালে একই জাতের সাথে বারবার প্রজনন করালে সে জাতের রক্ত বেশী এসে যায় ফলে পরবর্তীতে এ দেশের আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোতে অসুবিধা ও রোগাক্রান্ত হয় বিধায় এ ধরনের প্রজনন থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

গাভী বা বকনা গরম হওয়ার লক্ষণ ঃ

- হাম্বা হাম্বা করে উচ্চ স্বরে ডাকে, অশান্ত থাকে, অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ওঠে এবং কান খাড়া করে রাখে।
- যোনীমুখ দিয়ে স্বচ্ছ আঠালো ঝিল্লি নিঃসৃত হয় এবং মাটি পর্যন্ত ঝুলতে দেখা যায়।
- অন্য গাভীর উপর লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করে ও স্থির হয়ে দাড়িয়ে নিজের উপর অপরকে উঠতে প্ররোচিত করে।

- স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোমর নীচু করে রাখে, যোনী মুখ খুলে যায়, যোনীপথ লাল হয় ও লেজের গোড়ায় সংযোগ স্থল উঁচু হয়।
- অন্য গাভীর যৌনাঙ্গ শুকতে/চাটতে থাকে ও ঘন ঘন প্রস্রাব করে এবং লেজ নাড়াতে থাকে।
- খাদ্য খাওয়ার পরিমাণ কমে যায় অথবা খাদ্য গ্রহণ বন্ধ থাকে ও দুগ্ধবতী গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যায়।
- গরম হওয়া সময়কালের স্থায়ীত্ব মাত্র এক দিন। এই সময় গ্রাফিয়ান ফলিকুল পরিপক্ক/পরিপুষ্ট হয়ে ডিম্বানু নিঃসৃত হয়।
- জরায়ুর সংকোচন ও প্রসারন ঘটতে থাকে এবং রক্তে ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোন সর্বোচ্চ পরিমাণে থাকে ও লিটুনাইজিং হরমোনের প্রবাবে ওভুলেশন ঘটে।

গাভীর প্রজননঃ
গাভী গরম হলে ষাঁড় দেখানো বা বীজ দেয়ার প্রক্রিয়াকে প্রজনন বলা হয়। গাভীর প্রজনন সাধারনতঃ ২ প্রকার

১. প্রাকৃতিক প্রজনন
১. কৃত্রিম প্রজনন

প্রাকৃতিক প্রজননঃ
গাভী গরম হলে ষাঁড় দেখানোর মাধ্যমে প্রজনন করানোর প্রক্রিয়াকে প্রাকৃতিক প্রজনন বলা হয়।

কৃত্রিম প্রজননঃ
গাভী গরম হলে প্রক্রিয়াজাত ষাঁড়ের বীজ দিয়ে প্রজনন করানোর প্রক্রিয়াকে কৃত্রিম প্রজনন বলা হয়।

কৃত্রিম প্রজননের উদ্দেশ্যঃ
- দেশীয় কম উৎপাদনশীল জাতের গবাদিপশুর দ্রুত জাত উন্নয়ন।
- উন্নত জাতের গবাদিপশু উৎপাদনের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের ঘাটতি পুরণ।
- উন্নত জাতের গবাদিপশু প্রতিপালনের মাধ্যমে আত্ন-কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল জাতের বাছুর

কৃত্রিম প্রজননের সুবিধাঃ
- একটি ষাঁড়ের বীজ দিয়ে অনেক গাভীকে প্রজনন করা যায়।
- অনেকদিন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করাযায়।
- জুনোটিক রোগ হতে প্রতিরোধ করা যায়।
- বাছুর আকারে বড়হ য়।
- দুধ ও মাংস বেশী পাওয়া যায়।
- আয় বেশী
- উন্নত জাতের তুলনায় রোগ বালাই কম হয়
- আমাদের দেশী আবহাওয়ায় পালন সম্ভব

অসুবিধাঃ

- তুলনামূলক বেশী খাদ্য দিতে হয়।
- দেশীর তুলনায় রোগ বালাই বেশি হয়।
- সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা দরকার হয়।
- প্রসবের সময় সমস্যা হতে পারে।

কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফ্লোচার্টঃ

১ম বংশের বাচ্চা = ১০০% দেশী উন্নত জাত x ১০০% বিদেশী জাত (ফ্রিজিয়ান)
৫০% দেশী উন্নত রক্ত + ৫০ % বিদেশী রক্ত
বিদেশী জাতের ৫০ % রক্তের গাভী

২য় বংশের বাচ্চা = বিদেশী জাতের ৫০% রক্তের গাভী x ১০০% বিদেশী বীজ
বিদেশী জাতের ৭৫ % রক্তের গাভী
দেশী জাতের ২৫ % রক্ত

৩য় বংশের বাচ্চা = বিদেশী জাতের ৭৫% রক্তের গাভী ১ x ০০% বিদেশী বীজ
বিদেশী জাতের ৮৭.৫ % রক্তের গাভী
দেশী জাতের ১২.৫ % রক্ত

৪র্থ বংশের বাচ্চা = বিদেশী জাতের ৮৭.৫% রক্তের গাভী ১ x ০০% বিদেশী বীজ
বিদেশী জাতের ৯৩.৭৫ % রক্তের গাভী
দেশী জাতের ৬.২৫ % রক্ত

৫ম বংশের বাচ্চা = বিদেশী জাতের ৯৩.৭৫% রক্তের গাভী x ১০০% বিদেশী বীজ
বিদেশী জাতের ৯৬.৮৭৫ % রক্তের গাভী
দেশী জাতের ৩.১৩% রক্ত

৬ষ্ঠ বংশের বাচ্চা = বিদেশী জাতের ৯৬.৮৭৫% রক্তের গাভী x ১০০% বিদেশী বীজ
বিদেশী জাতের ৯৮.৯৩ % রক্তের গাভী
দেশী জাতের ১.০৭ % রক্ত

৭ম বংশের বাচ্চা = বিদেশী জাতের ৯৮.৯৩% রক্তের গাভী x ১০০% বিদেশী বীজ
বিদেশী জাতের ৯৯.৪৬ % রক্তের গাভী
দেশী জাতের ০.৫৪ % রক্ত

সংকর জাতের ষাড়ের মাধ্যমে গরুর জাত উন্নয়ন

প্রজননের উপযুক্ত সময় ঃ

- গাভী বা বকনা গরম হওয়া বা ডাকে আসার পর উপযুক্ত সময়ের মধ্যেই প্রজনন করানো উচিত।
- গাভীর ইস্ট্রাস চক্রের ৩য় ভাগ বা কামোত্তর পর্ব শুরুর আগেই প্রজনন করানোর উপযুক্ত সময়।
- ডাকে আসার ১২-১৮ ঘন্টার মধ্যেই প্রজনন করানো উত্তম (অর্থাৎ সকালে গরম হলে বিকালে এবং বিকালে হলে সকালে), এতে সফলতার হার সর্বাধিক। এই সময়ের আগে বা পরে প্রজনন করালে আনুপাতিক হারে সফলতার সম্ভাবনা কমতে থাকে।

৬ ঘন্টা	৬ ঘন্টা	৬ ঘন্টা	৬ ঘন্টা
ডাক শুরু		প্রজননের উপযুক্ত সময়	ডাক শেষ
১ → ৬	৭ → ১২	১৩ → ১৮	১৯ → ২৪

চিত্র ঃ গাভী/বকনার স্বাভাবিক গরম পিরিয়ড, তবে অনেক সময় ৩০-৩২ ঘন্টা পর্যন্ত লক্ষণ প্রকাশ থাকতে পারে।

কৃত্রিম প্রজনন ফলপ্রসু না হওয়ার কারণ ও করণীয় ঃ

গাভীর মালিকের অজ্ঞতা ঃ গাভীর শারীরবৃত্তীয় অবস্থা, প্রজননকারীর দক্ষতা ও সিমেন বা বীজের গুণাগুণের কারণে কৃত্রিম প্রজনন সফল নাও হতে পারে।

গাভীর মালিকের অজ্ঞতা ঃ গাভী বা বকনা গরম হওার লক্ষণ না জানা বা না বুঝা, জানা বা বুঝার পরও সঠিক সময়ে প্রজনন করতে ব্যর্থতা, প্রজনন পরবর্তী সঠিক যত্ন না নেয়া, বিশ্রাম না দেয়া, ইত্যাদি কারণে কৃত্রিম প্রজনন বিফল হতে পারে।

গাভীর শারীরবৃত্তীয় অবস্থা ঃ গাভী বা বকনা সংক্রামক যৌন রোগে আক্রান্ত থাকলে, জনন অঙ্গে প্রদাহ বা ক্ষত থাকলে, হরমোন নিঃসরণে ভারসাম্য বজায় না থাকা, অনিয়মিত ডাকে আসার প্রবণতা ও নীরব ডাক, বয়সাধিক্য বা বয়স স্বল্পতা, অপুষ্টি, ইত্যাদি কারণে কৃত্রিম প্রজনন ব্যর্থ হতে পারে।

প্রজননকারীর দক্ষতা ঃ অভিজ্ঞতা না থাকায় বা আনারী বা শিক্ষানবিশ হওয়ার ক্রটিপূর্ণভাবে ভুল স্থানে বীজ স্থাপন করা, প্রজননের সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত ও সঠিক না থাকা, গরম পিরিয়ডের অবস্থা বুঝতে না পারা, ইত্যাদি কারণে কৃত্রিম প্রজনন সফল নাও হতে পারে।

সিমেন স্ট্র ও বীজের গুণাগুণ ঃ দুর্বল বা মৃত শুক্রাণুযুক্ত বীজ ব্যবহার, অগ্রসর গতির শুক্রাণুর সংখ্যা কম থাকা, অধিক বয়স্ক বা কম বয়সী ষাড়ের বীজ ব্যবহার, ক্রটিপূর্ণভাবে বীজ সংরক্ষণ ও পরিবহন, হিমায়িত বীজের বেলায় ক্রটিপূর্ণ থোয়িং, ইত্যাদি কারণে কৃত্রিম প্রজননের সফলতার হার কমে যেতে পারে।

করণীয় ঃ উপরে বর্ণিত ক্রটিগুলো এড়িয়ে সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তিকে দিয়ে সঠিক স্থানে সঠিক বীজ স্থাপন করতে হবে।

গাভী গর্ভাবস্থা হওয়ার লক্ষণঃ

প্রজনন করার পর ২১ দিন বা মাসাধিক কাল পেরিয়ে গাভী বা যদি পুনরায় ডাকে না আসে, তবে ধরে নেয়ার অবকাশ আছে যে গাভীটি গর্ভধারণ করেছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে গাভী ডাকে না আসলেও নানা কারণে গাভী গর্ভধারণ নাও করতে পারে। এজন্য গাভী গর্ভধারণ পরীক্ষা করা প্রয়োজন। দু'ভাবে এই পরীক্ষা করা যায়। যথা ঃ

১. গর্ভধারণে গাভীর বাহ্যিক পরিবর্তন ঃ

- প্রজননের পর মাসাধিক কাল পেরিয়ে গেলেও গাভী/বকনা পুনরায় ডাকে আসবে না।
- অন্য গরু বিশেষ করে ষাড়কে এড়িয়ে চলবে এবং চঞ্চলতা থাকবে না, শান্ত হবে।
- দুগ্ধবতী গাভী হলে দুধ উৎপাদন সামান্য কমে আসতে পারে।
- গাভীর স্বাস্থ্য তুলনামূলক উজ্জ্বল ও চকচকে হতে থাকবে এবং পেট বাড়তে থাকবে।
- যোনীমুখ নরম ও ফুলা ফুলা হবে এবং বকনার ওলান একটু একটু বাড়তে থাকবে।

২. গর্ভধারণে গাভীর অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঃ

- প্রজননের ৬-১২ সপ্তাহ যদি ডাকে না আসে তবে রেকটাল পালপেশন পদ্ধতিতে জরায়ু পরখ করতে হবে। এজন্য বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা বেশী, কেননা রেকটাল পালপেশনে করপাস লুটিয়ামের ক্ষতি হতে পারে।
- জরায়ু গ্রীবা অর্থাৎ সার্ভিক্স বন্ধ থাকবে ও ডিম্বাশয়ে করপাস লুটিয়াম বড় অনুভূত হবে।
- তিন মাসের গর্ভাবস্থায় জরায়ু হর্ণের যে অংশে ফিটাস থাকবে উহা অপর হর্ণ থেকে মোটা ও বড় হবে।
- ফিটাসের হার্ট বিট অনুভূত হবে।
- রাসায়নিক পরীক্ষা পদ্ধতিতেও গর্ভধারণ নিশ্চিত হওয়া যায়।

অনাকাঙ্খিত গর্ভপাতের কারণ ঃ

- রোগ জীবাণুর আক্রমণ যেমন ব্রুসেলোসিস, ভিব্রিওসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, লেপ্টোস্পাইরোসিস ইত্যাদি রোগের কারণে গর্ভপাত হতে পারে।
- শারীরিক আঘাত যেমন আছড়ে পড়ে যাওয়া, অন্য প্রাণী বা গরুতে পেটে বড্ড আঘাত পাওয়া, বাড়তি কাজের চাপ, ইত্যাদি কারণে গর্ভপাত হতে পারে।
- অপুষ্টি জনিত কারণ বিশেষ করে ভিটামিন (এ, ডি, ই) ও খনিজের (ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়োডিন) অভাবজনিত কারণে গর্ভপাত হতে পারে।
- বিষক্রিয়ার কারণে গর্ভপাত হতে পারে।
- ক্রটিপূর্ণ বা ভুল চিকিৎসার কারণে গর্ভপাত হতে পারে।
- গর্ভবতী গাভীকে ভুলবশতঃ কৃত্রিম প্রজনন করার কারণে গর্ভপাত হতে পারে।

গর্ভবতী গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা ঃ

- গর্ভ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে এবং বাচ্চা প্রসবের সম্ভাব্য সময় বা দিন তারিখ নির্ণয় করতে হবে।
- গর্ভবতী গাভী দিয়ে হালচাষ, লাঙ্গল টানা, গাড়ী টানা, ঘানি টানা, ধানের খড় মাড়ানো ইত্যাদি শ্রমসাধ্য কাজ করানো যাবে না।
- কোনরূপ দৌড় ঝাঁপ করানো, উত্তেজিত করা বা ভয় দেখানো যাবে না।
- গর্ভবতী গাভী দুগ্ধবতী হলে গর্ভধারণের ৭ মাসের পর দুগ্ধ দোহন ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনতে হবে।
- গাভীকে সপ্তাহে দু-একদিন সাবধানে গোসল করানো এতে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।
- নিজের পুষ্টি ও গর্ভের বাচ্চার বেড়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর সবুজ ঘাস ও দানাদার খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

- ➢ নিয়মিত সহজপাচ্য খাদ্য দিতে হবে এবং কোনরূপ সমস্যাবোধ হলে স্থানীয় পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- ➢ থাকার জায়গায় যেন কোনরূপ উঁচুনিচু বা গর্ত না থাকে, প্রয়োজনে বিচালী বিছিয়ে আরামদায়ক পরিবেশ দিতে হবে।
- ➢ দলের অন্যান্য গরু থেকে পৃথক রেখে যত্ন ও পরিচর্যা করতে হবে।

সেশনঃ ৫

- গর্ভবতী গাভীর যত্ন
- প্রসবকালীন সময়ে করণীয় বিষয়সমূহ
- নবজাতক বাছুর ও গাভীর যত্ন।
- গাভীর দুধ দোহনের কৌশল
- মান সম্মত দুধ পাওয়ার উপায় ও সংরক্ষণ

গর্ভবতী গাভী, নবজাত বাছুর ও দুগ্ধবতী গাভীর বিশেষ যত্নঃ

গর্ভবতী গাভীর যত্নসমূহ নিম্নরুপঃ

- ✓ গাভীর গর্ভধারন কালের হিসাব ও সম্ভাব্য বাচ্চা প্রসবের তারিখ জানা থাকতে হবে
- ✓ গভকালের সাতমাস পর্যন্ত গাভীর খাদ্য পরিচর্যা দুধ দোহন, স্বাভাবিক ভাবেই চলবে। তবে, ৭ মাসের পরেই গাভীকে অবশ্যই পৃথক করতে হবে। এই সময় খাদ্য পরিচর্যা ও বাসস্থান গাভীর অবস্থার উপযোগী হতে হবে।
- ✓ ঘরের মেঝে যদি পেচন দিকে ঢালু থাকে তবে তা সমতল করে দিতে হবে।
- ✓ পর্যাপ্ত আলো, বাতাস সুপরিসর, সহজেই গাভী নড়াচড়া করতে পারে
- ✓ গাভীর ঘর দৈনিক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে জীবানুনাশক ওষুধ মিশ্রিত পানি দ্বারা ঘর ধুয়ে দিতে হবে।
- ✓ গাভী যেন পড়ে গিয়ে আঘাত না পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ✓ গর্ভবতী গাভীর উপর অন্য কোন গরু বা প্রাণি যেন লাফিয়ে না উঠতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ✓ গর্ভাবস্থায় (৭-৮) মাসেই দুধ দোহন বন্ধ করতে হবে। দুধের প্রবাহ বন্ধ না হলে দানা খাদ্য কিছুটা কমিয়ে দিতে হবে
- ✓ গাভীর শোবার জায়গাতে খড় দিয়ে বিছানো তৈরী করে দিতে হবে। বিছানার খড় দৈনিক রোদে শুকাতে হবে।
- ✓ গাভীকে কোনক্রমেই ভয় পাওয়ানো, দ্রুত তাড়ানো বা উত্তেজিত করা যানে না।
- ✓ গর্ভবতী গাভী দ্বারা হালটানা, ভারবহন , ফসল মাড়াই ইত্যাদি কাজ করানো যাবে না
- ✓ গরমের দিনে গাভীকে প্রতিদিন গোসল করাতে হবে।
- ✓ আসন্ন প্রসবা গাভীকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে হবে। প্রসবের ২/৩ দিন আগে থেকে ২৪ ঘন্টা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাখতে হবে।

আমরা যদি উপরের বিষয়গুলি মেনে চলি তাহলে গাভী নিরাপদে প্রসব করবে।

প্রসবের পূর্বাভাসঃ

- ✓ প্রসাবের দ্বার ফুলে যাবে বা প্রসারিত হবে
- ✓ ঘন ঘন ওঠা বসা করবে
- ✓ লেজের দুই-সাইডে গোড়ার মায়সটা বসে যাবে
- ✓ সাদা স্রাব বের হবে
- ✓ পেট ব্যথার জন্য গাভী সর্বদা ছটফট করবে
- ✓ পানি ভাংবে

উপরের লক্ষণগুলো বুঝে গাভীর প্রসবের জন্য নিুক্তভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে।

প্রসবকালীন সময়ে করণীয় বিষয়সমূহঃ

- ✓ প্রথমে পা এবং মাথা এক সাথে বের হবে যদি এর একটা অঙ্গ যদি না আসে তাহলে এটাতে কোনভাবেই হাত দেওয়া যাবে না
- ✓ যদি তিনটা অঙ্গ একসঙ্গে আসে তাহলে হাতটা জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- ✓ এক্ষেত্রে খুব সর্তকর্তা অবলম্বন করতে হবে।

দুগ্ধবতী গাভীর যত্নঃ

দুগ্ধবতী গাবীর উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যা না হলে দুধ উৎপাদন কমে যায় নানান রোগ ব্যাধির আক্রমনও ঘটতে পারে। তাই দুগ্ধবতী গাভীর সর্বোচ্চ দুধ উৎপাদন, উর্বরতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত যত্ন ও পরিচর্যা প্রয়োজন

- ✓ দুগ্ধবতী গাভীকে খাদ্য খাওয়ানো, শরীর পরিস্কার, দুধ দোহন, ব্যায়াম প্রভৃতি কাজ নিয়মিত যথাসময়ে করতে হয়
- ✓ প্রত্যহ কমপক্ষে দু'বার গো-শালার মেঝে পরিস্কার করতে হবে।
- ✓ গো- শালার দেয়াল, মেঝে, নালা নর্দমা জীবানূনাশক (ডেটল বা ফিনাইল) মিশ্রিত পানি দিয়ে প্রত্যহ পরিস্কার করতে হবে।
- ✓ গাভীকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন ও শীতকালে সপ্তাহে দু'বার গোছল করিয়ে কাপড় দিয়ে মুছে ফেলা উত্তম।
- ✓ গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমান খাদ্য খাওয়ানোর উপর নির্ভর করে। গাভীর দৈহিক ওজন, উৎপন্ন দুধের পরিমান, দুধে চর্বির মাত্রা, গর্ভাবস্থা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে খাদ্য তালিকা পমিনসহ তৈরী করতে হবে। উপযুক্ত পরিমান সুষম খাদ্য প্রতিদিন খাওয়াতে হবে।
- ✓ খাদ্যের পাশাপাশি পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে
- ✓ গাভীর আরামদায়ক শয়নের জন্য গো-শালার মেঝেতে খড় বিছিয়ে দিতে হবে
- ✓ গাভীকে দিবা রাত্রি গো-শালায় রেখে পালন করলে স্বাস্থ্যহানী ঘটে। তাই গাভীকে প্রতিদিন ২-৩ ঘন্টার জন্য মাঠে ছেড়ে দেয়া উত্তম একেবারে ছেড়ে দেয়ার অসুবিধা থাকলে লম্বা দড়ি দিয়ে মাঠে বেঁধে দেয়া যায়। এ ব্যবস্থায় গাভীর ব্যায়ামের কাজ হয়।
- ✓ নবজাত বাছুকে শালদুধ খাওয়াতে হবে। এত বাছুরের উপকার হবে উপরোক্ত গাভীর দুধ দান ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে শালদুধ ওলানে থেকে গেলে গাভীর ঠুনকো রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে।
- ✓ দুধ দোহনের পূর্বে ওলান, বাট ও পিছনের অংশ অল্প গরম পানিতে ডেটেলমিশিয়ে কাপড় চুবিয়ে ভালভাবে মুছে দিলে বিশুদ্ধ ও পরিস্কার দুধ পাওয়া যায়।
- ✓ দুধ দোহনকালে গাভীকে আঘাত বা বিরক্ত করা, লাল কাপড় দেখানো ইত্যাদি ঠিক নয়। আবার কোন আগন্তুক ব্যক্তি বা আশে পাশে যাতে কুকুর বিড়াল না থাকে সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এ সবের কারনে দুধ কমে যায়।

নবজাত বাছুরের যত্নঃ

দুগ্ধ খামারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে বাছুরের সন্তোষজনক অবস্থার উপর। নবজাত বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। তাই নবজাত বাছুর খুবই রোগ সংবেদনশীল। এমতাবস্থায় সামান্য যত্নের অভাবে বাছুরের মৃত্যু ঘটতে পারে। তাই সুস্থ সবল বাছুর পেতে হলে যেমন গর্ভাবস্থায় গাভীর সুষ্ঠ যত্ন ও পর্যাপ্ত সুষম খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি প্রসবকালীন ও নবজাত বাছুরের যত্ন নেয়া আবশ্যক। প্রসবের সময় নিকটবর্তী হলে গাভীকে নজরে রাখতে হয়। কারন প্রসবকালে তেমন অসুবিধা দেখা দিলে সময়মত ব্যবস্থা নিতে হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারনত কোনরুপ সাহায্য ছাড়াই বাচ্চা প্রসব হয় তবে ফিটাসের বা গাভীর জননতন্ত্রের অস্বাভাবিক অবস্থায় প্রসবকালে বিঘ্ন ঘটে এমতবস্থায় নিজে টানাটানি করে বাচ্চা প্রসব করানো ঠিক নয়। বরয় সঙ্গে সঙ্গে পশু চিকিৎসকের শরনাপন্ন হওয়া উচিত। সদ্যজাত বাছুরের নিম্নোক্ত ভাবে যত্ন নেয়া যায়।

১. বাচ্চা প্রসবের পরপরই বাচ্চার নাক ও মুখের লালা ও ঝিল্লী পরিস্কার করে দিতে হবে। নতুবা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতে পারে। যদি বাছুর প্রসব হওয়ার পর শ্বাস প্রশ্বাস না নেয় তবে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে বাছুরের বুকের পাঁজরের হাড়ে আস্তে আস্তে কয়েকবার চাপ প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া বাছুরের নাক, মুখে ফুঁ দিয়েও শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করা যায়।

২. বাছুরের নাক মুখ পরিস্কারের পর গাভীর সামনে শুকনো খড় বিছিয়ে রাখলে গাভী চেটে বাচ্চার গা পরিস্কার করে দেয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রথম বেলায় গাভীকে এ ব্যাপারে উদাসীন দেখা যায়। এ অবস্থায় শুকনো নরম খড়, কাপড় অথবা চট দিয়ে বাছুরের গা ভালভাবে পরিস্কার করে দিতে হবে। কোনক্রমেই নবজাত বাছুরের শরীর পানি দিয়ে ধোয়া যাবে না। এতে বাচ্চা মারা যেতে পারে।

৩. শীতে বা অতিরিক্ত ঠান্ডায় শুকনো কাপড় বা চট দিয়ে বাছুরকে ঢেকে দিতে হবে। অথবা জ্বালিয়ে বাছুরের শরীর গরম রাখঅর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. বাছুরের নাভী রজ্জু দেহ থেকে ১-২ ইঞ্চি বাড়তি রেখে পরিস্কার জীবানু মুক্ত কাচি দিয়ে কেটে দিতে হয়। কাটার পর স্থানটিতে টিংচার আয়োডিন লাগাতে হবে। এর ফলে নাভীরজ্জু দিয়ে দেহে রোগ জীবানু প্রবেশ করতে পারেনা। নাভীরজ্জু বেঁধে না দেওয়াই ভাল।

৫. সুস্থ সবল বাছুর জন্মের ১৫ মিনিটের পর থেকেই উঠার চেষ্টা করে এবং দুধ খেতে সক্ষম হয়। অনেক সময় বাছুর দাঁড়াতে ও দুধ খেতে পারে না। এ অবস্থায় বাছুরকে দাড়াতে এবং দুধ খেতে সাহায্য করতে হবে। প্রসবের ১-২ ঘন্টার মধ্যে বাছুরকে তার মায়ের শাল দুধ খাওয়াতে হবে। এই দুধ ২৪ ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই খাওয়ানো উচিত। বাছুরের প্রতি ১০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১ কেজি শাল দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। যদি বাছুর কোন রোগ দূর্বলতার কারণে দাড়াতে বা দুধ খেতে না পারে তবে বোতলে নিপল লাগিয়ে দুধ খাওয়াতে হবে।

৬. গ্রামাঞ্চলে অনেকে অজ্ঞতা বসতঃ বাচ্চা প্রসবের পর গাভীর প্রথম দুধ বা শালদুধ খেতে না দিয়ে ফেলে দেয়। এটি বিজ্ঞান সম্মত নয়।

নবজাত বাছুরের প্রথম খাবার হিসাবে শালদুধ নিন্মোক্ত কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃ

- ✓ স্বাভাবিক দুধের চেয়ে শালদুধে ৩-৫ গুন অধিক প্রোটিন থাকে। এই প্রোটিনের অধিকাংশ রোগ প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে
- ✓ নবজাত বাছুরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধের কোন ক্ষমতা থাকেনা তাই বাছুরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শালদুধ বাছুরকে রোগের কবল থেকে রক্ষা করে।
- ✓ স্বাভাবিক দুধের চেয়ে শালদুধে ৫-১৫ গুন অধিক ভিটামিন থাকে
- ✓ বাছুরের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষা ও দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজ পর্দাথ শালদুধে যথেষ্ট পরিমানে থাকে।
- ✓ শালদুধ একটি রেচক পদার্থ হিসেবে নবজাত বাছুরের পরিপাক তন্ত্রে যে হলুদ বর্নের বিপাক জাত মল জমে থাকে তা বের করে দিয়ে খাদ্য অন্ত্রককে পরিস্কার করে

৭. বাছুরের জন্মের প্রথম কয়েক সপ্তাহ প্রতিটি বাছুরকে পৃথক ভাবে খাচার মেঝেতে শুস্ক খড় বিছিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. বাছুরের বদ হজম বা পাতলা পায়খানা হলে দুধ খাওয়ানোর পরিমান অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে। এছাড়া দুধকে প্রথমে ফুটিয়ে ও পরে ঠান্ডা করে দেহের তাপ অনুযায়ী খাওয়াতে হবে।

৯. প্রসবের পরপরই কোন কারনে গাভীর মৃত্যু ঘটলে বাছুরকে অন্য গাভীর শালদুধ খাওয়ানো যায়।

তাপমাত্রা বৃদ্ধিকালীন সময়ে গাভীর ব্যবস্থাপনা ঃ

- ➢ পরিবেশের তাপমাত্রা হঠাৎ বেড়ে গেলে গাভীকে বাতাস চলাচলযুক্ত ঠান্ডা গাছতলায় কিংবা অনুরূপ আরামদায়ক স্থানে রাখতে হবে। রাত্রিকালিন তাপমাত্রা এমনিতেই দিনের চেয়ে কমে যায়।
- ➢ গোয়াল ঘরের চাল বা ছাদ উঁচু করে তৈরী করা উত্তম। ঘরে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। টিনের চাল হলে সিলিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ➢ বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলে ফ্যানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ➢ দিনের বেলা সবুজ ঘাস ও রাতের শুকনা খড় খেতে দেয়া যেতে পারে।
- ➢ নিয়মিত গোসল করাতে হবে ও পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ ও ঠান্ডা পানি খেতে দিতে হবে।

দুধ উৎপাদন পরিবর্তনের কারণসমূহ ঃ

কৌলিক গঠনের প্রস্তাব ঃ গাভীর দুগ্ধ উৎপাদনের উপর কৌলিক গঠনের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। দুগ্ধ জাতের ভাল গাভীর দুধ উৎপাদন ক্ষমতা দেশী জাতের গাভীর চেয়ে বেশী।

খাদ্য সরবরাহ ঃ সবুজ ঘাস সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য সরবরাহ না করলে দুধের উৎপাদন আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাবে। গাভীর মুখে দিলে ঘাস, দুধ পাবেন বার মাস। অর্থ্যাৎ গাভীর মুখে খাদ্য দিলে দুধ বেশী পাবেন।

দোহন ঃ দোহনের ত্রুটি, দোহনকারী পরিবর্তন, দোহনের স্থান ও সময় পরিবর্তন, দোহনের সময় অনাকাঙ্খিত ব্যক্তি বা প্রাণির উপস্থিতি দুগ্ধ উৎপাদনের উপর প্রভাব ফেলে এবং উৎপাদন কমে যেতে পারে। দোহনের পূর্বে বাছুর দিয়ে গাভীর ওলানের দুধ বাটে নামিয়ে আনতে হবে অন্যথায় উৎপাদন কমে যাবে। দীর্ঘ সময় পর একবার দোহনের চেয়ে অল্প সময়ের ব্যবধানে দৈনিক ২-৩ বার দোহনে অধিক দুধ পাওয়া যায়।

গাভীর বয়স ঃ তৃতীয় বার বাচ্চা প্রসবের পর গাভীর দুধ উৎপাদনের হার সবচেয়ে বেশী। ৯-১০ বছর বয়সের পর থেকে দুগ্ধ উৎপাদন কমতে থাকে।

শারীরিক বৈশিষ্ট্য ঃ গাভীর আকার ও ওজানের সাথে দুধ উৎপাদনের সম্পর্ক বিদ্যমান। ছোট গাভীর চেয়ে বড় গাভীর ওলান তুলনামূলক বড় বিধায় দুধ উৎপাদন বেশী হয়।

গর্ভকাল ঃ দুগ্ধবতী গাভী গর্ভবতী হলে গর্ভধারণ কাল বৃদ্ধিও সাথে সাথে দুধ উৎপাদন কমতে থাকে।

পরিবেশের প্রভাব ঃ অতি শীত বা অতি উষ্ণ তাপমাত্রায় খাদ্র গ্রহণ কমে যায়, ফলে দুধ উৎপাদন কমে যায়। পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা ২২-২৫ ডিগ্রী সে. হলে খাদ্য গ্রহণ ও উৎপাদন ভাল থাকে।

পানির প্রভাব ঃ গাভীর চাহিদানুযায়ী পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ না করলে দুধের উৎপাদন কমে যায়।

শারীরিক সুস্থতা ঃ যেকোন ধরনের শারীরিক অসুস্থতায় দুধের উৎপাদন কমে যেতে পারে। সুস্থতার জন্য প্রয়োগকৃত ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় দুধের উৎপাদন কমে যেতে এমনকি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ডাকে আসা ঃ গাভী দুগ্ধ প্রদানকালীন সময়ে ডাকে আসলে বা গরম হলে হরমোনের প্রভাবে দুধের উৎপাদন কমে যেতে পারে।

ওলান ও বিভিন্ন বাটের প্রভাব ঃ সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত ওলানে দুধ বেশী থাকে। সামনের বাটের চেয়ে পিছনের বাটের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বেশী।
যত্ন ও পরিচর্যা ঃ গাভীর দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যার ঘাটতি হলে বা কোনরূপ তারতম্য হলে দুধ উৎপাদনের তারতম্য হবে।

গর্ভবতী গাভীর প্রসব বেদনার লক্ষণ ঃ
বাচ্চা প্রসবের পূর্বে গাভীর দেহে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেশ কিছু বাহ্যিক লক্ষণ ফুটে উঠে যা দেখে বুঝা যায় যে গাভীর প্রসব বেদনা অবশ্যম্ভাবী। যেমন :

- গাভীর ওলান ফুলে উঠে আকার বাড়তে থাকে।
- গাভীর তলপেট বেশ ঝুলে পড়বে।
- লেজের গোড়ার দুপাশে গর্তের মত আকার স্পষ্ট হবে।
- যোনীমুখ দিয়ে সাদা তরল আঠালো পদার্থ বের হতে দেখা যাবে।
- যোনীমুখ বড় হয়ে ঝুলে যাবে এবং নরম ও ফোলা ফোলা হয়ে যাবে।
- গাভী বার বার উঠা বসা করবে এবং অনেকটা বেদনা কাতর হবে।
- প্রসবের ৪-৮ ঘন্টা পূর্বে লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে।
- যোনীর পথ দিয়ে পানির থলি বেরিয়ে আসবে।
- গাভীর যোনী পথ দিয়ে বাছুরের সামনের দু'পা ও মুখ একসঙ্গে বেরিয়ে আসবে।

দুধ দোহন ঃ
প্রতিদিন নির্দিষ্ট একই সময় এবং একই দোহনকারী দ্বারা দুধ দোহন করতে হয়। হঠাৎ করে সময় বা দোহনকারীর পরিবর্তন হলে দুধ উৎপাদন কমে যায়। দুধ দোহনের পূর্বে দোহনকারীর হাত এবং গাভীর ওলান কুসুম কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে নেওয়া উচিত। আংশিক এবং অনিয়মিত দুধ দোহন গাভীর জন্য ক্ষতিকর। বাছুরের যতটুকু আহারের প্রয়োজন ততটুকু দুধ প্রথমে বাছুরকে চুষতে দিয়ে বাকী সম্পূর্ণদুধ দোহন করে নিতে হয়। দুধ ওলানে অবশিষ্ট রয়ে গেলে তা রক্তে মিশে যায়। প্রতি দিন একই সময় গাভী দোহন করা উচিৎ। সাধারণতঃ প্রতিদিন ২ বার দুধ দোহন করা দরকার। ৩ বা ৪ বার দুধ দোহনে যথাক্রমে ৫-২৫% এবং ১৫-৩৫% বেশী দুধ পাওয়া যায়।

গর্ভবতী গাভীকে দুগ্ধহীন করা/গাভীর দুধ দোহন বন্ধ করা ঃ
বাচ্চা প্রসবের ৪০ দিন পূর্বে গাভী দুধ দোহন একেবারে বন্ধ করে দেয়া উচিৎ। দুধ দোহন বন্ধ করার উদ্দেশ্য হলো- দুধ উৎপাদনকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে পরবর্তী সময়ের প্রস্তুতির জন্য পর্যপ্ত বিশ্রাম দেওয়া। এছাড়াও যাতে করে গাভীর দুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত খাদ্য গাভীর গর্ভস্থ বাচ্চার পুষ্টির কাজে লাগাতে পারে। গাভীর শরীরে খনিজ জাতীয় উপাদানের মজুদ গড়ে তোলা যা পরে দুধ উৎপাদনের কাজে লাগে। দুধ দোহন বন্ধ করলে বাচ্চা প্রসবের পূর্বে গাভীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। গর্ভাবস্থার শেষ দিকে অর্থাৎ গাভী বাচ্চা প্রসবের পূর্বে গাভীর দুধ উৎপাদন সাধারণত এমনিতেই বন্ধ করা যেতে পারে। যেমনঃ

সম্পূর্ণভাবে দুধ দোহন না করে ঃ গাভীর দুধ দোহন বন্ধ করার সময় হলে প্রথমত কয়েকদিন ওলানে সামান্য দুধ রেখে দোহন করতে হবে। তারপর দিনে একবার করে অসম্পূর্ণভাবে দোহন করতে করতে যখন বাঁট দিয়ে অতি সামান্য দুধ আসবে, তখন দোহন একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে।
অবিরাম দোহন করে ঃ যে গাভীকে দুগ্ধহীনা করতে হবে, সে গাভীকে প্রথমত বাচ্চা প্রসবের ৬০ দিন পূর্ব হতে দিনে একবার ১ দিন পর পর দোহন করে অবশেষে ৪০ দিনে দোহন একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে।
সেশনঃ ৬

- গাভীর রোগ বালাই পরিচিতি।
- রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা ।
- গাভী পালনের আয়-ব্যয় হিসাব।
- **ঘাসের চাষ ও এর ব্যবস্থাপনা**

সেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগনঃ

- গরুর রোগ বালাই সম্পর্কে জানবেন।
- রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানবেন।
- গাভী পালনের আয়-ব্যয় সম্পর্কে জানবেন।
- **ঘাসের চাষ এর ব্যবস্থাপনা** সম্পর্কে জানবেন।

সুস্থ প্রাণীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ

- চটপটে, সক্রিয় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমন্ধে সচেতন। নিয়মিত পদক্ষেপে চলবে।
- দৈহিক কাঠামো সুন্দর, চামড়া মসৃণ, চকচকে, ঢিলা থাকবে। কান থাকবে খাড়া।
- পা শরীরের তুলনায় খুব বেশী ছোট বা বড় হবে না, পেট মোটা হবে না।
- পিঠ লম্বা ও সরল রেখায় থাকবে, চোখ থাকবে উজ্জল এবং চোখের কোনায় কোন প্রকার ক্ষরণ বা পিচুটি থাকবে না।
- মাছি তাড়াতে সবসময় লেজ নাড়াবে, শ্বাস-প্রশ্বাস হবে মন্থর ও নিয়মিত, বিশ্রামের সময় নিয়মিত 'জাবর' কাটবে।

অসুস্থ প্রাণির সাধারণ বৈশিষ্ট্যঃ

- পশু রোগাক্রান্ত হলে শরীরের তাপমাত্রা কমে যায় বা বৃদ্ধি পায়।
- শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিবর্তন ঘটে ও খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখায়।
- জাবর কাটা বন্ধ হয়ে যায়/কমে যায়, পায়খানা পাতলা, শক্ত/নরম হতে পারে।
- কান ঝুলে পড়ে, আক্রান্ত প্রাণীকে বিমর্ষ ও অস্থির দেখায়।
- নাক দিয়ে পানি পড়া, কাশি হওয়া, ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া, লালা পড়া, চামড়া/লোম উস্কোখুস্কো হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

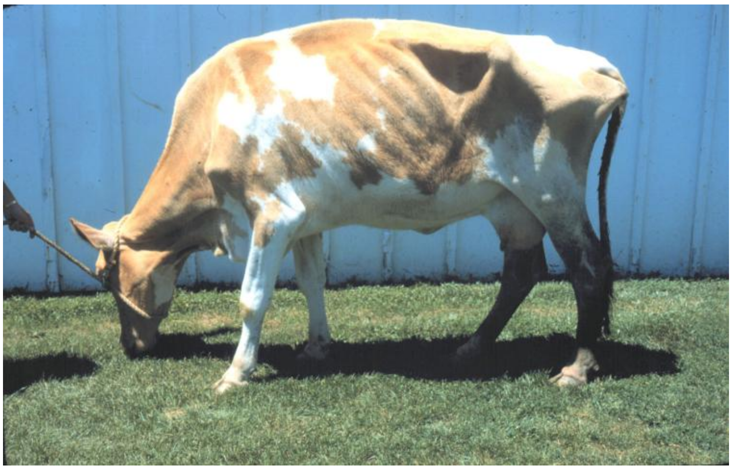

অসুস্থ্য গরু

রোগের প্রকারভেদ ও কারণ ঃ

- অসংক্রামক রোগঃ দুধজ্বর, কিটোসিস, হাইপোম্যাগনেসেমিয়া, প্রেগনেন্সি টক্সিমিয়া, হোয়াইট মাস্‌ল ডিজিজ, পেট ফাঁপা, হাড়ভাঙ্গা; মাত্রাতিরিক্ত ঔষধ, কীটনাশক, বিষাক্ত গাছ-গাছড়া ভক্ষণ, ইত্যাদি।
- সংক্রামক রোগঃ তড়কা, বাদলা, গলাফুলা, ধনুষ্টংকার, ওলানফুলা, যক্ষা, ক্ষুরা রোগ, ভাইরাল ডাইরিয়া, পি.পি.আর. ইত্যাদি। এসব রোগ ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়ে থাকে।
- অন্তঃপরজীবি জনিত রোগের জীবাণু সমূহঃ কলিজা কৃমি, হুক ওয়ার্ম, ফিতা কৃমি, চোখ কৃমি, স্টমাক ওয়ার্ম, সিস্টোসোমা, কাউর ঘা ইত্যাদি।
- রক্তে এককোষি প্রাণীঃ বেবিসিয়া, এনাপ্লাজমা, থাইলেরিয়া ইত্যাদি।
- বহিঃপরজীবিঃ আঠালি, উঁকুন, ছারপোকা, ম্যাগট বা মাছির ডিম ইত্যাদি।

রোগ বিস্তারের কারণ ঃ

অসুস্থ গবাদিপশুর পায়খানা, প্রস্রাব, লালা, চোখের/নাকের পানি, কাঁশি এবং এসব হতে নিঃসৃত তরল পদার্থ দ্বারা রোগজীবাণু বের হয়ে যে কোন খাদ্য, যন্ত্রপাতি, ব্যবহারিক জিনিসপত্র দূষিত করতে পারে। বাতাসে বাহিত হতে পারে এমনকি মাটি, পানি দূষিত করে ছড়াতে পারে। দূষিত বস্তুতে রোগ-জীবাণু অনেকদিন বিশেষ করে তড়কা বা এনথ্রাক্স রোগের জীবাণু ২০ বৎসর পর্যন্ত মাটিতে সক্রিয় থাকতে পারে। ক্ষুরা রোগের জীবাণু অনুকূল বাতাসের মাধ্যমে ৫০ কি. মি. দূরেও সক্রিয় অবস্থায় যেতে পারে।

রোগ জীবাণু কিভাবে শরীরে প্রবেশ করে ঃ

- দূষিত বায়ু, পানি ও খাদ্য গ্রহণ করলে, খাদ্যের পাত্র ও অন্যান্য ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি অপরিস্কার অবস্থায় ব্যবহার করলে জীবাণু খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে শরীরে প্রবেশ করতে পারে।
- পোকা-মাকড় যথা ঃ মশা-মাছি, আঠালী ও উকুনের আক্রমনের ফলে রক্ত শোষণের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে।
- সুস্থ গবাদিপশু অসুস্থ গবাদিপশুর সংস্পর্শে আসলে ও প্রজননের মাধ্যমে।

- বাছুরের দেহে মায়ের দুধের মাধ্যমে বা গর্ভাবস্থায় প্লাসেন্টাল রক্তনালীর মাধ্যমে।
- ইনজেকশন/ভ্যাকসিনের সময় একই সূঁচ অসুস্থ ও সুস্থ উভয় প্রাণীতে ব্যবহার করলে।

রোগ বিস্তারের সহায়ক কারণসমূহ ঃ

- বাতাসে আর্দ্রতা (৮০% ভাগ পানি), তাপমাত্রা (২৬ ডিগ্রী সেঃ) ও পারিপার্শ্বিক নোংরা অবস্থা।
- পুষ্টির অভাবে অর্থাৎ গবাদি পশু পরিমিত খাদ্য না পেলে তার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- অতিরিক্ত পরিশ্রম ও শীত জনিত কারণে শরীর দুর্বল হলে।
- কোন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় শরীরের শক্তি কমে গেলে।
- গর্ভবতী অবস্থায় সঠিক পরিচর্যা ও পুষ্টি না পেলে গাভী ও তার পেটের বাচ্চা সহজেই রোগাক্রান্ত হতে পারে।
- শরীরে রোগ জীবাণু সুপ্ত অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে উক্ত রোগের লাইভ/ইনএকটিভেট ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হলে।
- গবাদিপশুর আবাসস্থলে বা চারণ ভূমিতে বন্য/অন্যান্য জীবজন্তু পাখি, পোকামাকড়, মশা, মাছি, কেঁচো ইত্যাদি অবাধে চলাফেরা করলে বা বেশী পরিমানে/সংখ্যায় থাকলে রোগ জীবাণু সহজেই বিস্তার লাভ করে।
- মৃত গবাদিপশু বা হাঁস-মুরগি মাঠে, নদী, ডোবায় বা রাস্তার ধারে ফেলে রাখলে।
- একই বাহনে সুস্থ্য ও অসুস্থ্য প্রাণি বহন করলে।

গাভীর রোগ, প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা ঃ

১. ক্ষুরা রোগ ঃ ভাইরাস জনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ।

রোগের লক্ষণ ঃ

- প্রথমাবস্থায় আক্রান্ত পশুর জ্বর হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা ১০৩-১০৫ ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়।
- মুখ ও ক্ষুরে ঘা এ রোগের প্রধান লক্ষণ
- মুখ দিয়ে লালা পড়ে
- আক্রান্ত পশু খেতে পারে না, হাঁটতে পারে না, পশু দুর্বল হয়ে যায়।
-

ক্ষুরা রোগ

প্রতিরোধ ও প্রতিকার ঃ

- সুস্থ অবস্থায় ক্ষুরা রোগের টিকা দিতে হবে।
- আক্রান্ত পশুকে আলাদা করে রাখতে হবে।
- রোগাক্রান্ত গরুর বাসস্থান জীবাণুনাশক ঔষধ দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে। ক্ষতস্থান জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি দিয়ে ধুয়ে পরিস্কার রাখতে হবে। পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ০.১% সলিউশন দ্বারা ২/৩ বার মুখ ও পা ধুয়ে গ্লিসারিন বা মুধতে বোরিক এসিড মিশিয়ে ক্ষতস্থানে লাগাতে হবে।
- নিকটস্থ প্রাণি চিকিৎস্যকের পরামর্শ নিতে হবে।

২. **তড়কা রোগ ঃ** ব্যাকটেরিয়াজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ।

রোগের লক্ষণ ঃ

- আক্রান্ত পশুর দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।
- দেহের পশম খাড়া হয়ে যায়। শরীর কাঁপতে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও গভীর হয়ে থাকে।
- অতি তীব্র রোগের ক্ষেত্রে আক্রান্ত পশুর আকস্মিকভাবে মৃত্যু ঘটে যে চিকিৎসার প্রায় সময়ই পাওয়া যায় না।

- আক্রমণের তীব্রতায় অনেক সময় নাক, মুখ ও মলদ্বার দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়।
- পশু আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ে ও শরীর খিঁচুনি দিয়ে পড়ে মারা যায়।
-

তড়কা আক্রান্ত মৃত গরু

প্রতিকার ও প্রতিরোধঃ

- সুস্থ পশুকে প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।
- মৃত পশুকে গভীর গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে অথবা আগুনে পোড়াতে হবে। কোনক্রমেই পশুর চামড়া ছিলা যাবে না।
- আক্রান্ত প্রাণিকে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে।
- নিকটস্থ প্রাণি চিকিৎস্যকের পরামর্শ নিতে হবে।

৩. **বাদলা রোগ ঃ** ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ।

রোগের লক্ষণ ঃ

- অল্প বয়সের গরুতে এ রোগ দেখা দেয়।
- তীব্র রোগে প্রথমে জ্বর হয় ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে পেছনের অংশের মাংসপেশী ফুলে যায়।
- ফোলা জায়গায় চাপ দিলে পচ্ পচ্ শব্দ হয়।
- আক্রান্ত অংশ কালচে হয়ে যায় ও পচন ধরে।
- রোগাক্রান্ত পশু দুর্বল হয়ে মারায় যায়।

প্রতিকার ও প্রতিরোধঃ

- সুস্থ পশুকে প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।
- আক্রান্ত প্রাণিকে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে।
- নিকটস্থ প্রাণি চিকিৎস্যকের পরামর্শ নিতে হবে।

৪. **গলাফুলাঃ**

গবাদিপশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি মারাত্মক রোগ।

রোগের লক্ষণঃ

- আক্রান্ত পশুর দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।
- শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও গভীর হয়ে থাকে।
- মুখ দিয়ে লালা ও নাক দিয়ে সর্দি বের হয়।
- গলার নীচে, চোয়াল, বুক, কানের অংশে পানি জমে ও ফুলে যায়।
- ফোলা অংশ শক্ত ও ছিদ্র করলে হলুদ বর্ণের তরল বের হয়।
- শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয় ও ঘর ঘর শব্দ হয়।
- অতি তীব্র রোগের ক্ষেত্রে আক্রান্ত পশুর ২৪ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটে

প্রতিকার ও প্রতিরোধঃ

- আক্রান্ত পশুকে দ্রুত আলাদা করে দিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বছওে ১ বার টিকা দিতে হবে।
- পরিস্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে পশুকে রাখতে হবে ও বাসস্থানে জীবাণুনাশক ছিটাতে হবে।
- সালফোনেমাইড বা অক্সিটেট্রাসাইক্লিন বা উভয় ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

৫. **ওলন প্রদাহ ঃ** ব্যাকটেরিয়াজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ।

রোগের লক্ষণ ঃ

- ওলান ফুলে যায়। ওলানে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে গরম অনুভব হয়। ওলানের ভেতর পুঁজ হয়।
- দেহের তাপ বেড়ে যায়।
- দুধ ছানার মতো ছাকা ছাকা হয়। দুধে রক্তাক্ত হলুদ বর্ণের তলানি পড়ে।
- বাট ক্রমশ শক্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

প্রতিকার ঃ

- আক্রান্ত পশুকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখতে হবে।
- নিয়মিত দুধ দোহন করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে দুধ যেন ওলানে জমে না থাকে। ওলান গরম অনুভব হলে দিনে কমপক্ষে ৮-১০ বার ঠান্ডা পানি ওলানে দিতে হবে।
- ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা করা উত্তম।

নিউমোনিয়া ঃ ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ।

লক্ষণ ঃ

- বিভিন্ন ঘনত্বের নাসাস্রাব নির্গত হয়
- ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে থাকে
- খাওয়ার অরুচি ও শরীর শুকিয়ে যায়
- বুকে চাপ দিলে নাক দিয়ে শ্লেস্মা বের হয়
- বুকে চাপ দিলে ব্যাথা অনুভব করে থাকে
- গরু ঝিমাতে থাকে

প্রতিকারঃ

- ঠান্ডা থেকে প্রাণিকে রক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনবোধে আক্রান্ত পশুর গায়ে চট বা কম্বল জড়িয়ে দেয়া যেতে পারে।
- এন্টিবায়েটিক বা সালফার ড্রাগ্স ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাতলা পায়খানা ঃ

কারণ ঃ

ব্যাকটেরিয়া/ভাইরাস/কৃমি/অরুচিকর খাদ্য ভক্ষণ/রাসায়নিক দ্রব্যে বিষক্রিয়া ইত্যাদি।

লক্ষণ ঃ

- পাতলা পায়খানা
- পায়খানা দুর্গন্ধময়
- কখনও কখনও হজম না হওয়া খাদ্য বস্তু পায়খানার সাথে বের হয়ে আসে
- ক্ষুধা মন্দা দেখা দেয়
- পেটে ব্যাথা হয়
- তাপমাত্রা স্বাভাবিক/বেশি/কম থাকে

প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

- পর্যাপ্ত পরিমান পরিষ্কার পানি পান করাতে হবে
- উদরাময় রোধক পাউডার, যেমন এল্টোভেট খাওয়াতে হবে
- সালফার ট্যাবলেট যেমন ষ্টিনামিন ইত্যাদি খাওয়াতে হবে
- স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

পেট ফাঁপা ঃ

রোমন্থক প্রাণীর রুমেনে ফেনাযুক্ত গ্যাস জমার দরুন পেট ফুলে যায় বা দূষিত পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যের কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। এ ছাড়া খালি পেটে অধিক পরিমানে কচি, সবুজ, রসালো কলাই জাতীয় ঘাস খাওয়ালে পশু এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

লক্ষণ ঃ

- নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতে বেশ কষ্ট ও অস্বস্তি বোধ হয়
- আক্রান্ত পশু বারবার উঠা বসা করবে
- পেটে ব্যাথা হবে এবং নিজের পেটে নিজেই আঘাত করার চেষ্টা করবে
- দাঁতে দাঁত ঘষে কট্ কট্ শব্দ করবে
- পেটের ভার পায়ের উপর রেখে আড়াআড়িভাবে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে
- বাম দিকের পেটে থাপ্পর দিলে ড্যাব ড্যাব শব্দ হবে
- হঠাৎ পশু মারাও যেতে পারে

প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

- সাধারণভাবে রোগাক্রান্ত পশুর খাদ্য ও পানি বন্ধ করে দেয়া উচিত।
- রোগ প্রতিরোধের জন্য আস্তে আস্তে খাদ্যাভাস পরিবর্তন করাতে হবে এবং খাদ্যে আশ জাতীয় খাবার বেশি রাখতে হবে। এ ছাড়াও নিচে উল্লেখিত যে কোন ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারেঃ
- জিহ্বা টেনে বের করে গোড়ায় লবণ মালিশ করলে গ্যাস বের হয়।
- লবণ মিশ্রিত গরম পানি আদাসহ খাওয়ানো যেতে পারে।
- তারপিন তেল + সের আদা ছেঁচে তিসির তেলসহ একত্রে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।
- নিকটস্থ প্রাণি চিকিৎস্যকের পরামর্শ নিতে হবে।

পরজীবি ঃ

পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবন ধান করাকে পরজীবি বলে। অর্থাৎ কোন জীব যদি জীবন ধারণের ক্ষেত্রে অন্য আর একটি জীবে বাস করে সে জীবকে ক্ষতিগ্রস্থ করে নিজে লাভবান হয় তবে ঐ নির্ভরশীল জীবকে পরজীবি বলে।

পরজীবী সংক্রমন পদ্ধতিঃ

প্রধানত নিম্নলিখিতভাবে গ্রামীন পশুতে পরজীবী সংক্রামিত হয়ঃ

২. খাদ্যের মাধ্যমে - ঘাস
৩. দেহ ছিদ্রের মাধ্যমে
৪. মাধ্যমিক পোষকের মাধ্যমে-শামুক
৫. ওলানের মাধ্যমে
৬. সংস্পর্শে
৭. যৌন মিলন

পরজীবী আক্রমণে পশুর ক্ষতিঃ

১. পুষ্টি গ্রহন- কৃমি পশুর পুষ্টিকর পদার্থ খেয়ে ফেলে। এতে আক্রান্ড় পশু পুষ্টিহীনতায় ভোগে
২. পরজীবী রক্তপান, রক্তপাত, রক্ত চুষে নেওয়ায় পশু রক্তহীনতায় ভোগে
৩. পরজীবী পশুর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ (যেমনঃ কলিজা, ফুসফুস) নষ্ট করে দেয়।
৪. গর্ভপাত ঘটায়
৫. হজমে (পরিপাক ক্রিয়ায়) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

তাই বলা যায় পরজীবী বা কৃমি গবাদি পশুর শত্রু।

পরজীবীর প্রকার ভেদঃ

গবাদীপশুতে প্রধানত দুই ধরনের পরজীবী পাওয়া যায়ঃ

১. দেহের ভিতরের পরজীবী
২. দেহের বাইরের পরজীবী

১। দেহের ভিতরের পরজীবী বা কৃমিঃ

যে সমস্ত পরজীবী গবাদি পশুর দেহের ভিতরের বিভিন্ন অঙ্গে বাস করে আক্রমন করে সে সমস্ত পরজীবীকে দেহের বিতরের পরজীবী বলে।

দেহের ভিতরের পরজীবীর লক্ষণ সমূহঃ

১. পশু ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে ও পশু হাড্ডিসার হয়ে যায়
২. শরীরের লোম উসকো খুসকো হয়ে যায়
৩. খাওয়ার রুচি কমে যায়, ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়
৪. শরীরের ওজন কমতে থাকে ও দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না
৫. দুগ্ধবর্তী গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যায়
৬. রক্তশূন্যতা দেখা দেয়
৭. ফুসফুস আক্রান্ত হলে ঘন ঘন কাশি, শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত, শ্বাস গ্রহনে কষ্ট হয়
৮. গোবর চকচকে দেখায়, কখনো পাতলা কখনো শক্ত পায়খানা হয়

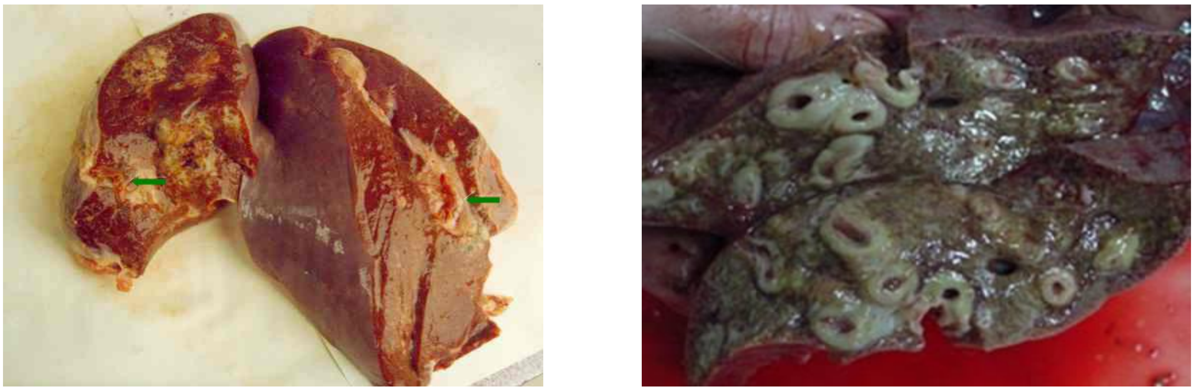

২
দে

কলিজা কৃমি দ্বারা আক্রান্ত কলিজা

বহিঃপরজীবী জনিত সাধারন ক্ষতিঃ

১. মৃত্যু- বহিঃ পরজীবী আক্রমনে পশুর মৃত্যু ঘটে
২. বিরক্তি ও উত্তেজনা- প্রায় সব বহিঃ পরজীবীর আক্রমনে গবাদি পশুর কম বেশি বিরক্তি সৃষ্টি হয়। ফলে আক্রান্ড় পশুর খাদ্য গ্রহন করতে অসুবিধা হয়। এত পশুর বৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদন কমে যায়
৩. লোম ও তৃক বিনষ্ট- এদের আক্রমনে লোম পড়ে যায় এবং চামড়ার ক্ষতি হয়
৪. পশু দুর্বল হয় এবং রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়
৫. চামড়া মোটা ও খসখসে হয়ে যায়
৬. দৈহিক ওজন হ্রাস পায়
৭. বহিঃ পরজীবী আক্রমনের ফলে পশুর বিভিন্ন অঙ্গ অবস হয়ে যায়
৮. এরা বিভিন্ন রোগের জীবানুর বাহক হিসেবে বিভিন্ন রোগ ছড়ায়
৯. চোখে ছানি পড়ে।

নিয়ন্ত্রণ/প্রতিরোধঃ

পশু চিকিৎসক এর পরামর্শক্রমে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর কৃমি নাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।

কৃমিনাশক প্রয়োগ/ডিওয়ার্মিং ঃ

পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে। বাছুরকে জন্মের ৭- ১৪ দিনের মধ্যে প্রথম কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হয়। প্রথম মাত্রা কৃমিনাশক খাওয়ানোর দুই সপ্তাহ পর ২য় মাত্রার কৃমিনাশক দিতে হয়। এ ছাড়াও প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে। পালের সকল পশুকে একই সাথে কৃমিনাশক ঔষধ দেয়া উত্তম। গাভী বাচ্চা প্রসবের এক সপ্তাহ আগে কৃমিনাশক দিতে হয়। তাছাড়া প্রতি বছর বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে ও বর্ষাকাল শেষ হওয়ার পরে সকল পশুকে কৃমিনাশক দিতে হয়।

কৃমি আক্রান্ত বাছুর

গরু ক্রয় করার পর শুরুতেই ৭-১০ দিনের মধ্যে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হয়। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর পালের সকল পশুকে কৃমি নাশক ঔষধ খাওয়াতে হয়। এক বার যে নামের ঔষধ খাওয়ানো হয় তিন মাস পরে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ালে তা যেন পূর্বে ব্যবহৃত একই নামের ঔষধ না হয়। ঔষধের মাত্রা নির্ধারণের জন্য পশুর ওজন নির্ণয় করে নিতে হবে। মাত্রা সঠিকভাবে না দিলে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে না।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় পশুকে রাখতে হবে। ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় ঘাস না খাওয়ানো উচিত নয়। স্যাঁতস্যাঁতে জমির ও পানির ভিতরের ঘাস খাওয়াতে হলে তা শুকিয়ে খাওয়ানো উত্তম। খড়, ঘাস এবং অন্যান্য পশু খাদ্য যাতে করে গোবর দ্বারা মিশ্রিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বাজারে সচরাচর যে সকল কৃমি নাশক ঔষধ পাওয়া যায় তার কয়েকটি নাম নীচে দেওয়া হয়ঃ

- ✓ **রেলনেক্স (Ralnex)** ৭.৫ মিলিগ্রাম/কেজি দৈহিক ওজন হিসেবে সেব্য।
- ✓ **পেরাক্লিয়ার (Paraclear)** ৫-৭.৫ মিলিগ্রাম/কেজি দৈহিক ওজন হিসেবে সেব্য।
- ✓ **আইভারমেকটিন-** (Ivermectin, MSD) ২০০ মাইক্রোগ্রাম/কেজি দৈহিক ওজন হিসেবে ত্বকের নীচে ইনজেকশন দিতে হয়। ইহা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক উভয় রকম কৃমির বিরুদ্ধে ভাল কার্যকর।
- ✓ **নাইট্রোনেক্স** (Nitronex) **১০** মিলিগ্রাম/কেজি দৈহিক ওজন হিসেবে ত্বকের নীচে ইনজেকশন দিতে হয়।
- ✓ হেলমেক্স (Helmex) ৭.৫ - ১০ মিলিগ্রাম/কেজি দৈহিক ওজন হিসেবে সেব্য।

টিকা প্রয়োগ ও রোগ প্রতিরোধ ঃ

গবাদিপশু প্রতিপালনের অন্যতম সমস্যা রোগ-বালাই। গবাদিপশু রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সতর্কতামূলক ব্যবস্তা হিসেবে গৃহীত পদক্ষেপকে রোগ প্রতিরোধ বলা হয়। একটি পশু অসুস্থ হওয়ার পর তাকে আরোগ্য করতে চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যয় তো আছেই, তদুপরি ভগ্ন স্বাস্থ্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনাও কষ্টসাধ্য। তাই রোগ যাতে পশুকে আক্রান্ত করার সুযোগ না পায় সেরকম ব্যবস্থা গ্রহন করাই শ্রেয়। সেজন্য স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা ও সুষম খাদ্য খাওয়ানোর পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধের টীকা প্রদান করা উচিৎ। গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধক টিকাবীজ বাংলাদেশেই পাওয়া যায়। প্রাণিসম্পদ বিভাগ মূলত এসব ভ্যাকসিন উৎপাদন করে, তবে কিছু কিছু ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী সরকারের পূর্বানুমতি নিয়ে কিছু কিছু রোগের ভ্যাকসিন আমদানী করে থাকে।

টিকা প্রদানের ফলাফল ঃ

- ➢ মারাত্মক সংক্রামক ও ক্ষতিকারক রোগের আক্রমণ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করা যায়।
- ➢ নির্দিষ্ট এলাকা/স্থানে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- ➢ গবাদিপশু রোগাক্রান্ত হলে যে অর্থ ব্যয় হয় যথাসময়ে এবং যথানিয়মে ভ্যাকসিন দিয়ে রোগ প্রতিরোধ করার মাধ্যমে তা সাশ্রয় করা যায়।

ছক-৩ ঃ গরুর বিভিন্ন প্রকার রোগের টিকা

টিকার নাম	প্রাণীর প্রজাতি ও বয়স	মাত্রা ও প্রয়োগ পথ	মেয়াদ	সংরক্ষণ
ক্ষুরারোগ (ট্রাই ভ্যালেন্ট)	গরু/মহিষ ৬ মাস	৯ সিসি চামড়ার নীচে	৬ মাস	৪০ থেকে ৮০ সে. তাপমাত্রায় ৬ মাস
তড়কা	গরু/মহিষ/ঘোড়া ১ বৎসর বা তদুর্ধ্ব	১ সিসি চামড়ার নীচে	১ বৎসর	৪০ থেকে ৮০ সে. তাপমাত্রায় ৬ মাস
গলাফুলা	গরু/মহিষ প্রাপ্ত বয়স্ক	২ সিসি চামড়ার নীচে	১ বৎসর	৪০ থেকে ৮০ সে. তাপমাত্রায় ৬ মাস
বাদলা	গরু/মহিষ ৬ মাস ও তদুর্ধ্ব	৫ সিসি চামড়ার নীচে	৬ মাস	৪০ থেকে ৮০ সে. তাপমাত্রায় ৬ মাস
জলাতংক	HEP: গবাদিপশু ৩ মাসের বেশী বয়সে	৩ সিসি মাংসপেশীতে	১ বৎসর (৩০ দিন পর বুষ্টার ডোজ)	-২০০ সে. তাপমাত্রায় ডীপ ফ্রিজে ১ বৎসর ০০ সে. তাপমাত্রায় ৪৮ ঘন্টা

গাভীকে টিকা প্রদান

টিকা প্রয়োগের সময় সাবধানতা ঃ

- জীবাণুমুক্ত/স্টেরিলাইজড সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।
- অসুস্থ পশুকে টিকা দেয়া যাবে না।
- সময় না হলে টিকা দেয়া যাবে না। যেমন- পশুর বয়স ও মেয়াদ বিবেচ্য।
- ছায়াযুক্ত স্থানে টিকা দিতে হবে।
- বেশী পেট ভর্তি করে খাওয়ার পর টিকা দেয়া যাবে না।
- খুব দুর্বল পশুকে টিকা দেয়া যাবে না।
- পরিশ্রান্ত পশুকে বিশ্রাম প্রদান না করে টিকা দেয়া যাবে না।
- রৌদ্রযুক্ত জায়গায় টিকা দেয়া যাবে না।
- মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকা দেয়া যাবে না।
- টিকা দেয়ার পূর্বে এবং পরে হাত ও যন্ত্রপাতি ধুয়ে নিতে হবে।

আমাদের দেশে ভ্যাকসিন/টিকা অকার্যকর হওয়ার কারণ ঃ

- টিকা প্রয়োগের সময় বাচ্চার শরীরে মায়ের কাছ থেকে পাওয়া এন্টিবডির পরিমান বেশী থাকলে।
- পূর্ব থেকেই যদি গবাদিপশু/হাঁস-মুরগি ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে বা অন্য রোগে আক্রান্ত থাকলে।
- ভ্যাকসিন সংরক্ষণে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ না করলে লাইভ ভ্যাকসিনের জীবাণু মারা যাবে ফলে ভ্যাকসিন কার্যকর হবে না।
- নির্ধারিত মাত্রায় ভ্যাকসিন প্রয়োগ না করা।
- যথাসময়ে মিশ্রিত ভ্যাকসিন ব্যবহার না করা (সাধারণত ভ্যাকসিন মিশ্রণের পর ২ ঘন্টার মধ্যে)।
- আবহাওয়া জনিত যে কোন ধরনের ধকল। যেমন- অতিরিক্ত গরম।
- ভ্যাকসিন করার যন্ত্রপাতি পরিস্কার এবং জীবাণুমুক্ত না করা।
- ভ্যাকসিনে সরাসরি সূর্যের কিরণ লাগা।
- জীবাণুর স্ট্রেইন-এর ভিন্নতার কারণে; যে স্ট্রেইন-এর বিরুদ্ধে টিকা দেয়া হয়েছে ঐ স্ট্রেইনের এন্টিজেন না হলে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসকারী ঔষধ বেশী সেবন বা ব্যবহার করলে।
- টিকা প্রয়োগের সময় পানির সাথে অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত হলে।
- উপযুক্ত বয়সে, সঠিকভাবে এবং পরিমাণমতো টিকা প্রয়োগ না করলে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টিকা মিশ্রণ এবং প্রয়োগ নিশ্চিত না হলে।

দুধ বাজারজাত করণঃ

- দোহনের পর দুধ পরিষ্কার ছাকনি বা কাপড় দিয়ে ছাকতে হবে।
- দুধের পাত্রটি ঢাকনাযুক্ত হলে ভালো, না হলে পরিষ্কার কাপড়, পলিথিন বা অন্য কোন পাত্র দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।
- দুধের পাত্রটি কোন ময়লা বা দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে রাখা যাবে না। কারন কড়া গন্ধ দুধ সহজেই নিতে পারে। (পেঁয়াজ বা শুটকি মাছের গন্ধ)
- দুধ দোহনের পর ৪-৫ ঘন্টার মধ্যে বাজারজাত অথবা প্রক্রিয়াজাত করা উচিত।
- দুধ বাজারে নিয়ে বিক্রয় করতে হলে বহন করার পাত্রটি পরিষ্কার ও শুকনা হতে হবে এবং তার ঢাকনা থাকতে হবে।
- দুধ বহন করার পাত্রটির ভিতরের দেয়াল মশৃন সমান থাকতে হবে। কোন রকম গর্ত, উঁচু নিচু বা ঢেউ ঢেউ থাকা যাবে না।
- দুধের পাত্রটি বহন করার সময় দুধ যাতে ঝাঁকিতে ঢলকে না পড়ে তার জন্য দুধের উপর পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে এবং পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে কলা পাতা অথবা খেজুর পাতা দিলে ভাল হয়।
- দুধে অবশ্যই পানি বা অন্য কোন বস্ড় মিশানো যাবে না।

গাভী পালনের আয়-ব্যয় হিসাব ঃ

৫টি গাভী সম্বলিত খামারের বিভিন্ন খরচ, আয় ও নীট মুনাফার হিসাব ঃ

মূলধন বিনিয়োগ ঃ

ক) জমি	**০.৫০ একর নিজস্ব**
১) ঘরবাড়ি নির্মাণ বাবদ	১৫ শতাংশ
২) ঘাস উৎপাদন বাবদ	সবুজ ঘাস উৎপাদনের জন্য অবশিষ্ট জমি ঘাস চাষের জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

খ) ঘরবাড়ি নির্মাণ

খরচের খাত	টাকার পরিমাণ
১। ৫টি গাভীর ঘর-২০ বর্গমিটার। প্রতি বর্গমিটার ৩,৭০০ টাকা হিসাবে (আর সিসি খুঁটি, সিআই সিট, ঢালাই মেঝে, টিনের চালাঘর)	
২। ৫টি (০-১) বৎসর বয়সের বাছুরের ঘর ১০ বর্গমিটার প্রতি বর্গমিটার ৩,৭০০ টাকা হিসাবে (আর সিসি খুঁটি, সি আই সিট, পাকা মেঝে, টিনের চালাঘর)	
৩। খাদ্য গুদাম ঃ ২*৩=৬ বর্গমিটার। (টিনের চালা, মেঝে পাকা) প্রতি বর্গমিটার ৩,৭০০ টাকা হিসাবে	
৪। গোবর রাখার গর্ত তৈরী বাবদ	
সর্বমোট টাকা=	

গ) গাভী ও যন্ত্রপাতি ক্রয় ঃ

১। প্রতিটি গাভী ২০,০০০/- হিসাবে ৫টি গাভীর ক্রয় মূল্য প্রতিটি গাভী কমপক্ষে ৬ লিটার দুধ প্রদানে সক্ষম হতে হবে (বাছুরের চাহিদা বাদে)	
২। যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় ঃ	
দুধের পাত্র, খাবার পাত্র, দুধ মাপার পাত্র, হুসপাইপ, টেবিল, চেয়ার, ইত্যাদি বাবদ	
সর্বমোট টাকা=	

আবর্তক খরচ ঃ

(খ) খাদ্য খরচ ঃ	
১। দানাজাতীয় খাদ্য ঃ ৫টি গাভীর দানা জাতীয় খাবার গড়ে ৬ লিটার দুধালো গাভীর জন্য দৈনিক ৪ কেজি, ২৮৫ দিন, দুধ না দেওয়া অবস্থায় ৮০ দিন ২ কেজি দানাদার খাদ্য হিসেবে মোট ৬,৫০০ কেজি প্রয়োজন	
প্রতি কেজি খাবার ১২ টাক হিসাবে (৬,৫০০*১২)=	
প্রতি বাছুর প্রতিদিন ১ কেজি হিসাবে ৩৩০ দিনে (৫*১*৩৩০)= ১,৬৫০ কেজি প্রয়োজন	
প্রতি কেজি ১২ টাকা হিসাবে (১,৬৫০*১২)=	
২। ছোবরা বা আঁশ জাতীয় খাদ্য ঃ খড় ঃ প্রতি গাভীর জন্য দৈনিক ৩ কেজি হিসাবে ৫টি গাভীর ১ বৎসরের খাদ্য ৫,৪৭৫ কেজি। প্রতি বাছুরের জন্য দৈনিক ১ কেজি হিসাবে ৫টি বাছুরের ৩৩০ দিনের খাদ্য ১,৬৫০ কেজি। মোট (৫,৪৭৫+১,৬৫০)= ৭,১২৫ কেজি খড় প্রয়োজন। প্রতি কেজি ১.০০ টাকা হিসেবে	
৩। কাঁচা ঘাস ঃ গাভী প্রতি দৈনিক ১২ কেজি হিসাবে ৫টি গাভীর ১ বৎসরের খাদ্য ২১,৯০০ কেজি। প্রতি বাছুরের জন্য দৈনিক ৩ কেজি হিসাবে ৫টি বাছুরের ৩৩০ দিনে খাদ্য ৪,৯৫০ কেজি। মোট (২১,৯০০+৪,৯৫০)= ২ ৬,৮৫০ কেজি কাঁচা ঘাস।	
প্রতি কেজি খাবার ০.৫০ টাকা হিসাবে (২৬,৮৫০*০.৫০)=	
৪। আনুষাঙ্গিক খরচ (ঔষধ, শেড মেরামত ও অন্যান্য)=	
৫। স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগ এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসাবে মোট ২,৩৮,৭০০.০০ ব্যাংক হইতে বাৎসরিক ১০% সুদ হারে ঋণ পাওয়া যাইবে এবং প্রতি বৎসর কিস্তিতেঋণ পরিশোধ করা হইবে।	
৬। অপচয় খরচ ঃ ক. ঘরবাড়ীর ২%	
খ. যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের ১০%	
সর্বমোট টাকা=	

খামারের উৎপাদন ও আয় ঃ

ক) প্রতি গাভী দৈনিক গড়ে ৬ লিটার করে দুধ দেয় ২৮৫ দিন (৫*৬*২৮৫)= ৮,৫৫০ লিটার	
প্রতি লিটার দুধের দাম ২৫ টাকা হিসাবে=	
খ) ৫টি গাভী ও বাছুরের গোবর (সার) বিক্রয় বাবদ=	
মোট টাকা=	
গ) ১ বৎসর বয়সের ৫টি শংকর জাতের বাছুর বিক্রয়মূল্য (৬,০০০*৫)= (২য় বৎসর থেকে) প্রতিটি ৫,০০০ টাকা হিসাবে	
মোট টাকা=	
ঘ) ৮ম বৎসরে ৫টি গাভী ও ৫টি বাছুর (প্রতিটি গাভী @১৫,০০০ টাকা ও প্রতিটি বাছুর @৬,০০০ টাকা)	
মোট টাকা=	

আয়-ব্যয়ের হিসাব

১) ১ম বৎসর আয়	
১ম বৎসর ব্যয়	
প্রকৃত আয়=	

২) ২য় বৎসর হইতে ৭ম বৎসর পর্যন্ত প্রতি বছর আয়	
২য় বৎসর হইতে ৭ম বৎসর পর্যন্ত প্রতি বছর ব্যয়	
প্রকৃত আয়=	

৩) ৮ম বৎসর আয় (গাভী ও বাছুর বিক্রয় মূল্য সহ)	
৮ম বৎসর ব্যয়	
প্রকৃত আয়	

১. ২৫টি গাভী সম্বলিত খামারের বিভিন্ন খরচ, আয় ও নীট মুনাফার হিসাব ঃ

মূলধন বিনিয়োগ ঃ

ক) জমি	**২.৫ একর নিজস্ব**
ঘাস উৎপাদন বাবদ	সবুজ ঘাস উৎপাদনের জন্য অবশিষ্ট জমি ঘাস চাষের জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

খ) ঘরবাড়ি নির্মাণ

১। ২৫টি গাভীর ঘর-৯৪ বর্গমিটার। প্রতি বর্গমিটার ৩,৭০০ টাকা হিসাবে (আর সিসি খুঁটি, সিআই সিট, ঢালাই মেঝে, টিনের চালাঘর)	
২। ২৫টি (০-১) বৎসর বয়সের বাছুরের ঘর ৫০ বর্গমিটার প্রতি বর্গমিটার ৩,৭০০ টাকা হিসাবে (আর সিসি খুঁটি, সি আই সিট, পাকা মেঝে, টিনের চালাঘর)	
৩। অফিস কঃ ৩*৪= ১২ বর্গমিটার (টিনের চালা, মেঝে পাকা) প্রতি বর্গমিটার ৩,৭০০ টাকা হিসাবে	
৪। খাদ্য গুদাম ঃ ৩*৫= ১৫ বর্গমিটার। (টিনের চালা, মেঝে পাকা) প্রতি বর্গমিটার ৩,৭০০ টাকা হিসাবে	
৫। মেটারনিটি হাউজ ২*৩= ৬ বর্গমিটার (টিনের চালা, মেঝে পাকা) প্রতি বর্গমিটার ৩,৭০০ টাকা হিসাবে	
৬। কোয়ারেন্টাইন হাউজ ২*৩= ৬ বর্গমিটার (টিনের চালা, মেঝে পাকা) প্রতি বর্গমিটার ৩,৭০০ টাকা হিসাবে	
৭। ম্যানুউর গোবর রাখার গর্ত তৈরী বাবদ	
সর্বমোট টাকা=	

গ) গাভী ও যন্ত্রপাতি ক্রয় ঃ

১। ২৫টি গাভী @২০,০০০/-, প্রতিটি গাভী কমপক্ষে ৬ লিটার দুধ প্রদানে সক্ষম	
২। যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় ঃ	
দুধের পাত্র, খাবার পাত্র, দুধ মাপার পাত্র, হুসপাইপ, টেবিল, চেয়ার, ইত্যাদি বাবদ	
৩। স্যালো ডিপ টিউবওয়েল বসানো সহ খরচ বাবদ	
সর্বমোট টাকা=	

মোট মূলধন বিনিয়োগ ঃ (৬,৭৮,১০০+৫,১৮,০০০)= ১১,৯৬,১০০.০০

আবর্তক খরচ ঃ

(ক) দৈনিক ১০০ টাকা হিসাবে ২ জন শ্রমিকের ১ বৎসরের খরচ (১০০*২*৩৬৫)= (একজন শিক্ষিত শ্রমিক খামারের হিসাব ও অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালনা করবে)	
(খ) খাদ্য খরচ ঃ	
১। দানাজাতীয় খাদ্য ঃ ২৫টি গাভীর দানা জাতীয় খাবার গড়ে ৬ লিটার দুধালো গাভীর জন্য দৈনিক ৪ কেজি, ২৮৫ দিন, দুধ না দেওয়া অবস্থায় ৮০ দিন ২ কেজি দানাদার খাদ্য হিসেবে মোট ৩২,৫০০ কেজি প্রয়োজন।	
প্রতি কেজি খাবার ১২ টাক হিসাবে (৩২,৫০০*১২)=	

২৫টি বাছুর প্রতিদিন ১ কেজি হিসাবে ৩৩০ দিনে (২৫*১*৩৩০)= ৮,২৫০ কেজি প্রয়োজন	
প্রতি কেজি ১২ টাকা হিসাবে (৮,২৫০*১২)=	
২। ছোবরা বা আঁশ জাতীয় খাদ্য ঃ খড় ঃ প্রতি গাভীর জন্য দৈনিক ৩ কেজি হিসাবে ২৫টি গাভীর ১ বৎসরের খাদ্য ২৭,৩৭৫ কেজি। প্রতি বাছুরের জন্য দৈনিক ১ কেজি হিসাবে ২৫টি বাছুরের ৩৩০ দিনের খাদ্য ৮,২৫০ কেজি। মোট (২৭,৩৭৫+৮,২৫০)= ৩৬,৬২৫ কেজি খড় প্রয়োজন। প্রতি কেজি ১.০০ টাকা হিসেবে=	
৩। কাঁচা ঘাস ঃ গাভী প্রতি দৈনিক ১২ কেজি হিসাবে ২৫টি গাভীর ১ বৎসরের খাদ্য ১,০৯,৫০০ কেজি। প্রতি বাছুরের জন্য দৈনিক ৩ কেজি হিসাবে ২৫টি বাছুরের ৩৩০ দিনে খাদ্য ২৪,৭৫০ কেজি। মোট ১,৩৪,২৫০ কেজি কাঁচা ঘাস। প্রতি কেজি খাবার ০.৫০ টাকা হিসাবে=	
৪। আনুষাঙ্গিক খরচ (ঔষধ, শেড মেরামত ও অন্যান্য)=	
৫। স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগ এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসাবে মোট ১১,৯৬.০০০.০০ ব্যাংক হইতে বাৎসরিক ১০% সুদ হারে ঋণ পাওয়া যাইবে এবং প্রতি বৎসর কিস্তিতেঋণ পরিশোধ করা হইবে।	
৬। অপচয় খরচ ঃ ক. ঘরবাড়ীর ২%	
খ. যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের ১০%	
সর্বমোট টাকা=	

খামারের উৎপাদন আয় ঃ

ক) প্রতি গাভী দৈনিক গড়ে ৬ লিটার করে দুধ দেয় ২৮৫ দিন (২৫*৬*২৮৫)= ৮,৫৫০ লিটার	
প্রতি লিটার দুধের দাম ২৫ টাকা হিসাবে=	
খ) ২৫টি গাভী ও বাছুরের গোবর (সার) বিক্রয় বাবদ=	
মোট টাকা=	
গ) ১ বৎসর বয়সের ২৪টি বাছুর বিক্রয়মূল্য (৬,০০০*২৪)= ১টি বাছুর মৃত্যু ধরা হইয়াছে	
মোট টাকা=	
ঘ) ৮ম বৎসরে ২৫টি গাভী @১৫,০০০ টাকা ও ২৪টি বাছুর @৬,০০০ টাকা হিসাবে বিক্রয় মূল্য=	
মোট টাকা=	

আয়-ব্যয়ের হিসাব

১) ১ম বৎসর আয়	
১ম বৎসর ব্যয়	
প্রকৃত আয়=	

২) ২য় বৎসর হইতে ৭ম বৎসর পর্যন্ত প্রতি বছর আয়	
২য় বৎসর হইতে ৭ম বৎসর পর্যন্ত প্রতি বছর ব্যয়	
প্রকৃত আয়=	

৩) ৮ম বৎসর আয় (গাভী ও বাছুর বিক্রয় মূল্য সহ)	
৮ম বৎসর ব্যয়	
প্রকৃত আয়	